2024

বাংলা
বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 1
জানুয়ারী ২০২৪

এক'শ বছরে পা রাখলো বোস সংখ্যায়ন

তার সঙ্গে অবধারিত ভাবে জুড়ে গেল তার গোষ্ঠীর পরিচয়সূচক নাম 'বোসন'। আর এই দ্বিতীয়াংশটি জন্য আরও বহু কণার মতই রয়েছে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের (1894-1974) অবদান। তাই সেখানে যুক্ত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের নাম থেকে উদ্ভূত 'বোসন' পরিচয়টি।

- শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা
- জলাভূমি জলাশয় নিয়ে কিছু কথা
- প্রকৃতিতে বন্ধুত্বের রকম-সকম
- যারা আলো জ্বেলেছিল
- ঘরে ঘরে রসায়ন

Shanti Foundation
RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

এক'শ বছরে পা রাখলো বোস সংখ্যায়ন ৫
ভূপতি চক্রবর্তী

শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা ৯
নকুল পারাশর

জলাভূমি জলাশয় নিয়ে কিছু কথা ১২
মোহিত রায়

আগাম ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ১৫
তুহিন সাজ্জাদ সেখ

বড় বাদুড় ১৮
অমর কুমার নায়ক

প্রকৃতিতে বন্ধুত্বের রকম-সকম ২০
অরুণিমা ভৌমিক

যারা আলো জ্বেলেছিল ২৩
অরুণাভ দত্ত

সোয়ালো পাখি ২৬
তাপস কুমার দত্ত

ঘরে ঘরে রসায়ন ২৮
অসীম বসাক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের জানুয়ারি মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৩০

জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩১

গ্রন্থ সমালোচনা ৩২

সংখ্যার মজা

$$2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3 + 8^3 + 9^3 = 2024$$

সম্পাদকীয়

স্বাগত 2024: বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রত্যাশায় ভরা নতুন বছরের আহ্বান

2023 কে বিদায় জানানোর এবং একটি নতুন বছরের নতুন সকালকে স্বাগত জানানোর মুহূর্তে, আসুন আমরা সবাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে অসাধারণ অগ্রগতিগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেগুলির দিকে একবার চেয়ে দেখি। 23 আগস্ট, 2023 ভারতের সফল চন্দ্র অভিযান, চন্দ্রযানের বিজয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। একই সাথে, বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকে উদ্ভাসিত করেছে অগণিত সাফল্য।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, ChatGPT এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলি গবেষণা পরীক্ষায় তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে সবার নজর কেড়েছে। ZFDesign এবং ProGen এর মত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলগুলি জিঙ্ক ফিঙ্গার ডিজাইন এবং প্রোটিন সিকোয়েন্স তৈরির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রয়োগবিধি প্রদর্শন করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, অনলাইন চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে রোগীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ChatGPT-এর ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রমান রেখেছে।

পোকার মস্তিষ্ক ম্যাপিং: কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি ফল-মাছি লার্ভার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন এবং সাইন্যাপসকে সতর্কতার সাথে ম্যাপিং করে একটি বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এই অগ্রগতি মস্তিষ্কের সংযোগবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছে।

কৃত্রিম মানব ভ্রূণ: কেম্ব্রিজ এবং ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল ব্যবহার করে কৃত্রিম মানব ভ্রূণ তৈরি করেছেন যা জিনঘটিত ব্যাধি এবং বারবার গর্ভপাতের কারণ অনুসন্ধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ক্রিওপ্রিজারভড র‍্যাট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট: মিনেসোটা ইউনিভার্সিটি একটি ক্রিওপ্রিজারভড ইঁদুরের কিডনি প্রথম সফল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেছে, যা ভবিষ্যতে মানবদেহে প্রয়োগের সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করেছে।

গর্ভবতী নারীদের জন্য RSV ভ্যাকসিন: এফডিএ গর্ভবতী নারীদের জন্য প্রথম টিকা অনুমোদন করেছে যা শিশুদের মধ্যে নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের গুরুতর রোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনতে সক্ষম। এটি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা: পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও পাওয়া গেছে ইতিবাচক খবর। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে উপলব্ধ প্রচুর উপাদান নিশ্চিত করেছেন যার মধ্যে বিরল পৃথিবীর খনিজ রয়েছে। এই উদ্ভাবন আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরের পথে সহায়ক হবে।

ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি সতর্কবাণী: মানোয়ার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় তুলে ধরেছে একটি মর্মান্তিক সতর্কবার্তা, তারা বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তির উদ্বেগজনক হারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটি মানব-চালিত ষষ্ঠ গণ বিলুপ্তির ঘটনার একটি প্রখর ইঙ্গিত বলে ধরা যেতে পারে।

অ্যান্টার্কটিক সাগরের রেকর্ডমাত্রায় বরফ হ্রাস: 10 সেপ্টেম্বর, 2023-এ, অ্যান্টার্কটিক সাগরের বরফ তার সর্বনিম্ন মাত্রায় পৌঁছেছে, যা মেরু অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাবের ইঙ্গিতবাহী।

মহাকাশে মিথাইল ক্যাটেশনের প্রথম সনাক্তকরণ: নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ একটি তরুণ তারকামণ্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ কার্বন অণু মিথাইল ক্যাটেশন সনাক্ত করেছে যা মহাকাশ গবেষণায় একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এই আবিষ্কারটি জীবনের গঠন সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

হিউম্যান জিনোম প্রকল্পের অগ্রগতি: হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের অগ্রগতির পথে অন্যতম সাফল্য সম্পূর্ণ জিনোম ক্রম একত্রিত করার জন্য ভার্কো সফ্টওয়্যার-এর বিকাশ। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহিত 47টি জিনোম সমন্বিত মানব প্যানজেনোমের একটি খসড়া রূপ প্রকাশ করা হয়েছিল। উপরন্তু, গবেষকরা সম্পূর্ণরূপে Y ক্রোমোজোম ম্যাপ করেছেন, 41টি অতিরিক্ত জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং DNA সিকোয়েন্সিং আগের তুলনায় নির্ভুলতর হয়েছে।

নতুন বছরে আমাদের যাত্রার সূচনা মুহূর্তে বিজ্ঞানের এই সাফল্য আগামীর পথকে উজ্জ্বলতর করবে, উদ্ভাবন, আবিষ্কার এবং জ্ঞানের অটল সাধনায় উদ্ভাসিত করবে ভবিষ্যতকে।

জানুয়ারী অধ্যাপক এস এন বোস এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান মনীষীদের জন্ম মাস। বিজ্ঞান কথা-র এই সংখ্যায় আমরা তাঁদের প্রতিভা, বিশেষ করে বিদেশী শাসনের অধীনে থাকা জাতির উত্তরণের সংগ্রামে তাঁদের নেতৃত্বের দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

সমগ্র বিজ্ঞান কথা পরিবারের পক্ষ থেকে সকল পাঠককে একটি পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ 2024-এর জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নিরলস সাধনা আমাদের জন্য আরও অনেক সুখবর বয়ে আনুক।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা
Januaru 2024 | Vol.II | Issue 1

উপদেষ্টামণ্ডলী
স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী
ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
এবং
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

গন্তব্য বিন্দুতে পৌঁছালো আদিত্য

গত বছরের 2 সেপ্টেম্বর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সূর্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রথম মিশন আদিত্য L1 মহাকাশ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিল। এই মুহূর্তে আদিত্য তার গন্তব্য পৃথিবী থেকে 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট (L1)-এ পৌঁছে গেছে। 6 জানুয়ারী আদিত্য L1 অবস্থানে পৌঁছায়। L1 বিন্দুতে স্থাপিত আদিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। আদিত্যকে L1 এর চারপাশে সূর্যের একটি প্রভাবযুক্ত কক্ষপথে পরিচালিত করা হবে যেখান থেকে এর মাধ্যমে সৌর ঝড়, বিকিরণ এবং সূর্য থেকে উদ্ভূত অন্যান্য নির্গমনের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। এমনকি পৃথিবীর দিকে ধাবিত হওয়ার আগে বা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে আসার আগেই সেগুলিকে সনাক্ত করা যাবে। এই অবস্থানে স্থিতিশীল মাধ্যাকর্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপগ্রহের মহাকাশে স্থিতিকালও দীর্ঘস্থায়ী হবে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে বিষয়টি সংশয়াতীত নয়। মহাকাশযানের গতি এবং গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য থ্রাস্টার ফায়ারিং প্রয়োজনীয়। যদি প্রথম প্রচেষ্টায় অভিপ্রেত কক্ষপথে উপগ্রহকে স্থাপন না করা যায় তবে পরবর্তীতে একাধিক সংশোধন এবং থ্রাস্টার ফায়ারিং প্রয়োজন হবে। এখনো পর্যন্ত আদিত্যের মধ্যে থাকা সবকটি যন্ত্র ভালভাবে কাজ করছে বলে জানা গেছে। তার মহাকাশ যাত্রার মাত্র 16 দিনের মধ্যে, 18 সেপ্টেম্বর থেকে আদিত্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ এবং সূর্যের ছবি তোলা শুরু করেছিল। সৌর শিখার উচ্চ-শক্তির এক্স-রে, সম্পূর্ণ সৌর ডিস্কের ছবি এবং আরো বেশ কিছু নতুন তথ্য আদিত্যের থেকে বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছেছে।

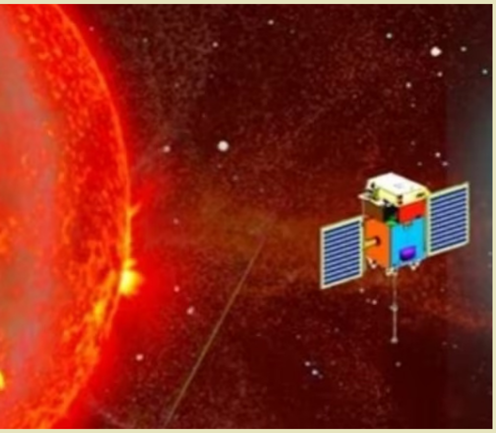

উভলিঙ্গ পাখি

ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী প্রফেসর হামিশ স্পেন্সার কলম্বিয়াতে ছুটি কাটানোর সময় একটি আশ্চর্যজনক অর্ধ-স্ত্রী, অর্ধ-পুরুষ পাখির দেখা পান। পাখিটি বন্য গ্রীন হানিক্রিপার যার অর্ধেক শরীর ছিল উজ্জ্বল সবুজ, বাকি অর্ধেক নীল। এই প্রজাতিতে পুরুষ পাখির রং নীল ও স্ত্রী পাখির রং সবুজ হয়। পাখিদের জন্য এই উভলিঙ্গ রূপ অত্যন্ত বিরল। অধ্যাপক স্পেন্সার বলেছেন যে এই অনন্য ঘটনাটি নিউজিল্যান্ডে পাওয়া কোনও পাখির প্রজাতিতে কখনও নথিভুক্ত করা হয়নি। এই অসাধারণ অর্ধ-স্ত্রী, অর্ধ-পুরুষ পাখি প্রকৃতির জটিল এবং আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রমের প্রমাণ হিসাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃতিকে জানার এখনো অনেক বাকি আছে। এই যৌন দ্বিরূপতা সাধারণত পোকামাকড়, ক্রাস্টেসিয়ান, মাকড়সা, টিকটিকি এবং ইঁদুর প্রজাতির মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই অসাধারণ ঘটনার পেছনের কারণ হিসাবে মনে করা হচ্ছে যে স্ত্রী কোষ বিভাজনের সময় একটি ত্রুটিপূর্ণ ডিম তৈরি হয়। সেটির দুটি পৃথক শুক্রাণু দ্বারা দ্বিগুণ নিষিক্তকরণ ঘটে, যা প্রাণীটির মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মনোমুগ্ধকর সমন্বয় তৈরি করে। এই আবিষ্কারটি জার্নাল অফ ফিল্ড অর্নিথোলজিতে একটি প্রতিবেদন রূপে প্রকাশের হয়েছে যা এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে গ্রিন হানিক্রিপার প্রজাতির গাইনান্ড্রোমর্ফিজমের দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। প্রফেসর স্পেন্সার পাখিদের মধ্যে লিঙ্গ নির্ধারণ এবং যৌন আচরণের রহস্য উদঘাটনে গাইনান্ড্রোমর্ফের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা গাছের বৃদ্ধিতে সহায়ক

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একটি বিদ্যুতের পরিবাহী কৃষিমাধ্যম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যা বার্লি চারার গড় বৃদ্ধি 15 দিনের মধ্যে 50 শতাংশে পৌঁছে দিতে পারে। হাইড্রোপনিক্স নামে পরিচিত এই মাটিহীন চাষ পদ্ধতিতে গাছের বৃদ্ধি বৈদ্যুতিকভাবে উদ্দীপিত হয়। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে শুধুমাত্র পারম্পরিক কৃষি পদ্ধতিতে বিশ্বের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাইড্রোপনিক্সের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় শহুরে পরিবেশেও খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। গবেষক দলটি একটি বিদ্যুত পরিবাহী চাষের মাধ্যম তৈরি করেছে যা হাইড্রোপনিক চাষের জন্য উপযোগী, এর নাম দেওয়া হয়েছে ই-সয়েল। প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস জার্নালে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে বিনা মাটিতে জলীয় মাধ্যমে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টিপদার্থ সরবরাহের মাধ্যমে চাষ করা হয়। এতে জলের প্রয়োজনও প্রথাগত চাষের থেকে অনেক কম। সাম্প্রতিক গবেষণায়, গবেষকরা দেখান যে হাইড্রোপনিক্স ব্যবহার করে বার্লি চারা চাষ করা যেতে পারে এবং বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার প্রয়োগে তাদের বৃদ্ধির হার আরও বৃদ্ধি পায়। বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা গাছের বৃদ্ধিতে কিভাবে সহায়তা করে তা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও গবেষণার বিষয়।

এক'শ বছরে পা রাখলো বোস সংখ্যায়ন

ভূপতি চক্রবর্তী

আপনি যদি পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র নাও হন কিংবা পদার্থবিদ্যার প্রতি আপনার খুব সীমিত আগ্রহ থাকে, তাহলেও আপনি সম্ভবত 2012 সালের একটি সাড়াজাগানো খবর সম্ভবত এখনও ভুলতে পারেন নি। 'ঈশ্বর কণা' বা গড পার্টিকেল নামে পরিচিত একটি কণার অস্তিত্ব। ইওরোপে এক বিশাল ও বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছিল একটি মৌলকণিকা। অনেকগুলি দেশের সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রয়াসে বহু প্রচেষ্টায়, বিপুল ব্যয়ে স্থাপিত এক অতি বিশাল ও আধুনিক যন্ত্রব্যবস্থায় (লার্জ হ্যাড্রন কলয়েডার, Large Hadron Collider বা সংক্ষেপে LHC) ওই কণিকা ধরা পড়ার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছিল।

কণাটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ এক অর্থে হয়েই ছিল। কারণ এই মৌলিক কণাটির যে অস্তিত্ব রয়েছে তা কিছু বিজ্ঞানী, যাদের অন্যতম ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিগস, তাত্ত্বিক ভাবে 1964 সাল নাগাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার অস্তিত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার কাজটি একেবারেই সহজ ছিল না। এই ক্ষুদ্র কণিকা ছিল এক সুচতুর অপরাধীর মতই গা ঢাকা দিতে অভ্যস্ত। আর বিজ্ঞানে কোনো তাত্ত্বিক পূর্বাভাস তা সে যতই গ্রহণযোগ্যই মনে হোক না কেন; কিংবা তা সে যত নামী বিজ্ঞানীর গবেষণাকাজের মধ্যে দিয়ে উঠে আসুক না কেন, যতক্ষণ তা পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা না পড়ছে ততক্ষণ সেই তত্ত্বভিত্তিক প্রস্তাবনা মর্যাদার আসন পাবে না; এক অর্থে তা গৃহিতও হবে না। তাই আবিষ্কৃত কণিকা একদিকে তার নামের প্রথম অংশটি পেল তার তাত্ত্বিক প্রবক্তার নাম থেকে আর তার সঙ্গে অবধারিত ভাবে জুড়ে গেল তার গোষ্ঠীর পরিচয়সূচক নাম 'বোসন'। আর এই দ্বিতীয়াংশটি জন্য আরও বহু কণার মতই রয়েছে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের (1894–1974) অবদান। তাই সেখানে যুক্ত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের নাম থেকে উদ্ভূত 'বোসন' পরিচয়টি।

অথচ হিগস বোসন হচ্ছে এমন একটি মৌলিক কণা যার ভূমিকার জন্য মহাবিশ্বের সকল বস্তুতে এসেছে ভর। কীরকম অবস্থা দেখুন, বস্তুর ভর আমাদের এক চেনা জিনিস, তত্ত্বগতভাবে গণনা করে সেই কণার কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু তার স্বীকৃতি নেই, যতক্ষণ তাকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ধরা যাচ্ছে। আর পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে ধরতে গেলে প্রয়োজন এক বিপুল আয়োজনের। একটি জনপ্রিয় ডাকনাম সহ এই অধরা কণা প্রায় এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। তার সনাক্তকরণের কাজটি ছিল অতি দুরূহ এ যেন ছিল ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়ার সমতুল। তাই কণার গায়ে পাকে চক্রে বসে গিয়েছিল 'ঈশ্বর কণা' নামটি। শেষমেশ যখন তাকে পাকড়াও করা গেল তার বৈজ্ঞানিক নামে সেই কণা চিহ্নিত হল তখনই আমরা পেয়ে গেলাম 'হিগস বোসন'। আর 2013 সালে পিটার গিগস ও ফ্রসোঁইয়া এঙ্গলার্ট যখন পদার্থবিদ্যার নোবেল জয় করলেন আরও একবার উচ্চারিত হল বোসনের নাম, আমরা আরও একবার স্মরণ করলাম সত্যেন্দ্রনাথের অবদানকে।

বিজ্ঞান সর্বদা সন্ধান করে প্রকৃতির দেওয়া নিয়মগুলিকে। যে নিয়ম জানতে, বুঝতে পারলে, তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় বহু পর্যবেক্ষণের কিংবা তার উপযুক্ত প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে কিছু নতুন উদ্ভাবনা। বিজ্ঞানের এই প্রয়াসের ফলেই আমরা এখন জেনেছি যে কিছু সংখ্যক মৌল কণিকা দিয়ে আমাদের পৃথিবীর সবকিছু তো বটেই এমনকি এই মহাবিশ্বেরও সবকিছু রূপ পেয়েছে। এই কণাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের মূলত দুটি দলে ভাগ করা যায়। একটি দল যে নিয়মগুলি মেনে চলে সেই নিয়মকে বলা হয় বোস সংখ্যায়ন (যার নাম গোড়াতে ছিল

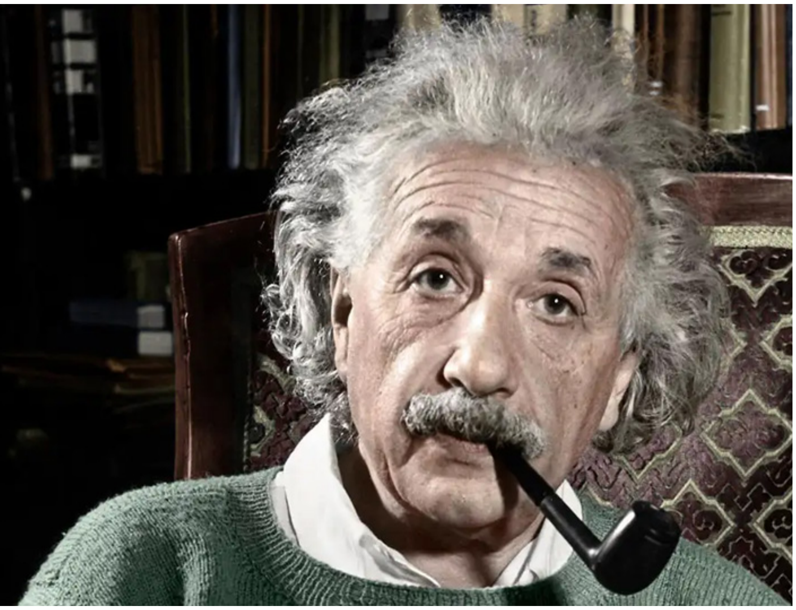

আইনস্টাইন

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন) আর অন্য দল যা মেনে চলে তাকে বলা হয় ফার্মি সংখ্যায়ন (গোড়াতে বলা হত ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন)। আর বোস সংখ্যায়ন মেনে চলা কণিকাদের সাধারণ নাম বোসন। বোস সংখ্যায়ন ও বোসন নামের সঙ্গে যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস, যিনি 1894 সালের 1 জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ভাবতে রোমাঞ্চ হয় যে মহাবিশ্বের প্রায় অর্ধেক মৌলকণার মেনে চলা নিয়মকে তিনি কেবল চিহ্নিত করেন নি, তাদের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্দ বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নাম। পদার্থবিদ্যায় তার এই অবদানটি এতটাই মৌলিক যে আইনস্টাইনকে তা কেবল মুগ্ধ করে নি তার নিজস্ব গবেষণাকাজে এনে দিয়েছিল নতুন দিশা।

অত্যন্ত উজ্জ্বল ছাত্র অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে তার বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। যদি আমরা ইতিহাসের দিকে ঘুরে দেখতে চেষ্টা করি তাহলে আমাদের একশ বছর পিছিয়ে যেতে হবে, 1924 সালে। সত্যেন্দ্র নাথ বোস, তখন ঢাকায় নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের রিডার। ঢাকা 1924 সালে সেই সময়ে অবিভক্ত ভারতের অংশ ছিল; বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী। এই ঢাকা থেকেই বোস 4 জুন, 1924-এ একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং প্রাপকের জায়গায় লেখা ছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে তো বটেই এমনকি তার বাইরেও সুপরিচিত একটি নাম, পদার্থবিদ্যার নোবেল বিজয়ী, আলবার্ট আইনস্টাইন। সেই সময়ে তিনি ছিলেন জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। বোসের চিঠির সাথে ছিল ইংরেজিতে লেখা চার পৃষ্ঠার একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র। সময়টা মনে রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে ঢাকা থেকে বোস এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন ডাক বিভাগের সাহায্যে এবং সেই সময় এইরকম চিঠি জাহাজে করে বার্লিন পৌঁছতে মোটামুটি তিন সপ্তাহ সময় নিত।

আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে গুগল ম্যাপ দেখলেই বোঝা যায় যে বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী এবং জার্মানির মধ্যে আঞ্চলিক দূরত্ব 7000 কিলোমিটারের থেকেও বেশি। গত একশ বছরে এই দূরত্ব একটুও বদলায়নি কিন্তু যোগাযোগের ধরণ বদলেছে এত বড় পথের। বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে একশো বছর আগে মানুষ কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত তা কল্পনা করা কঠিন। তার ওপর ডাক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পাঠানো চিঠি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ছিল বেশ চেনা।

বোসের এই চিঠিটি অবশ্য প্রত্যাশিত সময়েই বার্লিনের আইনস্টাইনের হাতে পৌঁছল। চিঠিটি ‘ঢাকা ইউনিভার্সিটি’-তে তার বিভাগের লেটারহেডে তিনি হাতে লিখেছিলেন, এবং চার পৃষ্ঠার গবেষণাপত্রটি ইংরেজিতে টাইপ করা ছিল। আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্য প্ল্যাঙ্কের সূত্রের উদ্ভবনা একটি ভিন্ন উপায়ে পৌঁছনোর পথ তার গবেষণাপত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে তার ধারণাটি অভিনব এবং প্রথাগত চিন্তা-ভাবনা থেকে আলাদা। তাই এই গবেষণাপত্রের মূল্যায়ন করার জন্য বোস আলবার্ট আইনস্টাইনকে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

তার আরও একটি কারণও ছিল। বস্তুত তিনি তার এই গবেষণাপত্রটি প্রথমে, সম্ভবত 1922 সালে, প্রকাশনার জন্য পাঠিয়েছিলেন লন্ডনের এক অতি নামী গবেষণা পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে। সত্যেন্দ্রনাথের পেপারে যে বৈপ্লবিক চিন্তা তুলে ধরা হয়েছিল তা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনের বিচারে স্বীকৃতি পায় নি, তারা পেপারটি তাদের জার্নালে প্রকাশের উপযুক্ত নয় বলে তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে বোসের সম্ভবত মনে হয়েছিল যে ছকভাঙা চিন্তার এই পেপারের বিষয়বস্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বিচারের জন্য পাঠালে কেমন হয়। সেই 1924 সালে আইনস্টাইনের নাম পদার্থবিদ্যার আঙিনা ছাড়িয়ে স্পর্শ করেছে অজস্র শিক্ষিত মানুষকে। কারণ আইনস্টাইন তার চিন্তাভাবনা ও গবেষণাকাজে অনেকগুলি প্রথাগত চিন্তার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন, রেখেছেন একেবারে নতুন দিশা যেগুলি আলোড়ন তুলেছে পদার্থবিদ মহলে তো বটেই, এমনকি অন্য শাখার পন্ডিত মহলে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেখানেও মিলেছে স্বীকৃতি। অন্তত নতুন চিন্তা বিচারের ভার তাকেই দেওয়া উচিত এটাই সম্ভবত তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। আইনস্টাইন সেই সময় এক অতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি কি অচেনা অজানা এক অধ্যাপকের চিঠি পড়ে দেখবার সময় পাবেন? তবু বোসের ভরসা ছিল যে তার ছকভাঙা চিন্তার মূল্যায়ন যদি কেউ করতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে আইনস্টাইন যোগ্যতম ব্যক্তি। কারণ আইনস্টাইন নিজেও তার ভর-শক্তির তুল্যতা বা প্রথমে বিশেষ ও তারপরে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যে চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছেন তা কেবল বিজ্ঞানী মহলে সাড়া ফেলে নি, প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় নি। কিন্তু আইনস্টাইন একের পর এক প্রথাগত চিন্তার বিপ্রতীপে গিয়ে নতুন ধারণা উপস্থাপিত করে গেছেন এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ উঠে এসেছে। আর তাই তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল তার এই নতুন চিন্তার বিষয়টি আইনস্টাইনের সামনে উপস্থিত করার।

বোসের লেখা চিঠির একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, আর ইংরাজিতে লেখা ঐ চিঠির বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।

“সম্মানিত স্যার,
আপনার পর্যবেক্ষণ এবং মতামতের জন্য আমি আপনাকে সহকারী নিবন্ধটি পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আপনি এটি সম্পর্কে কি মনে করেন তা জানতে আমি বিশেষ আগ্রহী। আপনি দেখতে পাবেন যে আমি ধ্রুপদী ইলেক্ট্রোডায়নামিক্স থেকে স্বাধীন প্ল্যাঙ্কের সূত্র সহগ ($8\pi\nu^2/c^3$) নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র ধরে নিয়েছি যে ফেজ-স্পেসে চূড়ান্ত প্রাথমিক অঞ্চলের বিষয়বস্তু h^3 রয়েছে। এই পেপার অনুবাদ করার পক্ষে যথেষ্ট জার্মান আমি জানি না। আপনি যদি মনে করেন যে পেপারটি প্রকাশের যোগ্য, তাহলে আপনি Zeitschrift für Physik-এ এটির প্রকাশনার ব্যবস্থা করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও আমি এমন অনুরোধ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করি না। কারণ আমরা সকলেই আপনার শিষ্য, যদিও হয়ত আমরা কেবল আপনার লেখার মাধ্যমে আপনার শিক্ষার দ্বারা লাভবান। আমি জানি না আপনার এখনও মনে আছে কি না যে কলকাতা থেকে কেউ আপনার সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ইংরেজিতে অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিল। আপনি সেই অনুরোধ স্বীকার করেছেন। এরপর থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। যারা সাধারণ আপেক্ষিকতার উপর আপনার গবেষণাপত্রটি অনুবাদ করেছে আমি তাদের একজন।”
বিনীত
সত্যেন্দ্রনাথ বোস

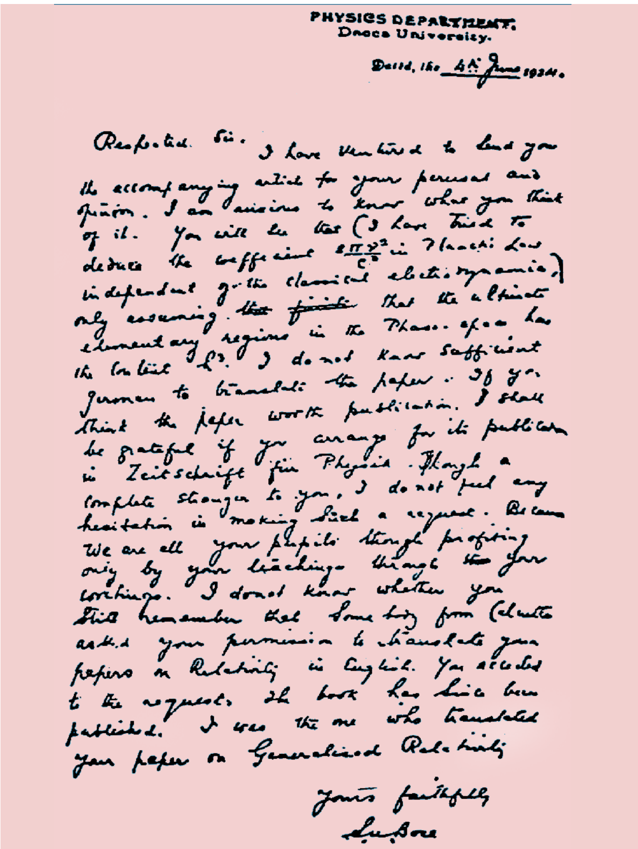
PHYSICS DEPARTMENT,
Dacca University.
Dated, the 4th June 1924.

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the coefficient $\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ in Planck's Law independent of the classical electrodynamics, only assuming that ~~the finite~~ the ultimate elementary regions in the Phase-space has the content h^3. I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift für Physik. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teachings through your writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised Relativity.

Yours faithfully
S.N. Bose

আইনস্টাইনকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিঠি

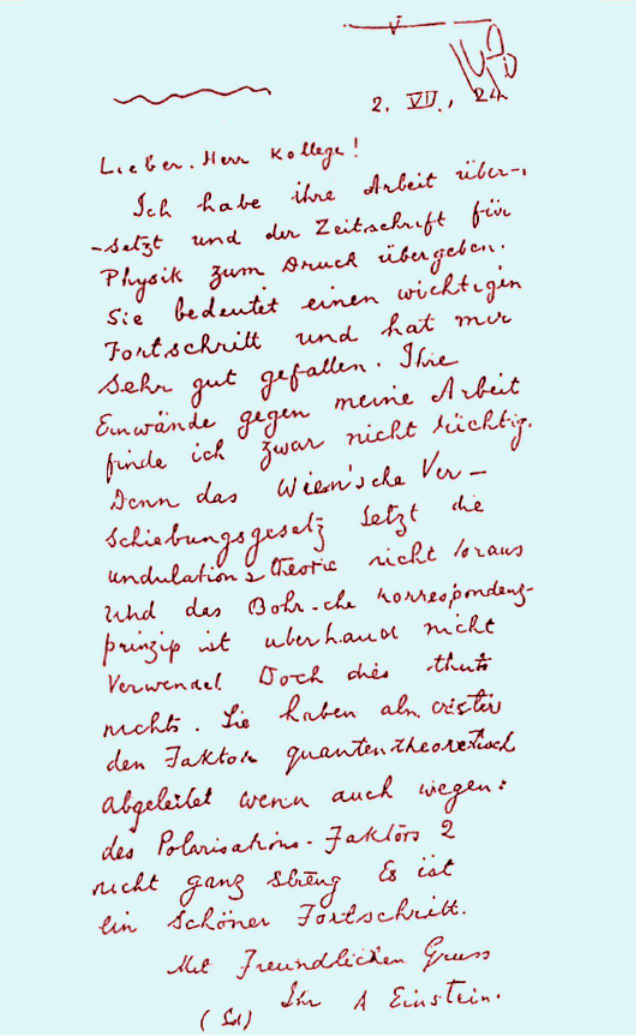
2. VII. 24

Lieber Herr Kollege!
Ich habe Ihre Arbeit übersetzt und der Zeitschrift für Physik zum Druck übergeben. Sie bedeutet einen wichtigen Fortschritt und hat mir sehr gut gefallen. Ihre Einwände gegen meine Arbeit finde ich zwar nicht richtig. Denn das Wien'sche Verschiebungsgesetz setzt die Undulationstheorie nicht voraus und das Bohr'sche Korrespondenzprinzip ist überhaupt nicht verwendet. Doch dies thut nichts. Sie haben als erster den Faktor quantentheoretisch abgeleitet wenn auch wegen des Polarisations-Faktors 2 nicht ganz streng. Es ist ein schöner Fortschritt.
Mit freundlichem Gruss
Ihr A. Einstein.
(Sd)

আইনস্টাইনের উত্তর

বার্লিনে আইনস্টাইন চিঠিসহ বোসের পেপারটি প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে পেয়েছিলেন। তিনি খুব সম্ভবত জুনের 25 বা 26 তারিখে চিঠিটি পান। তিনি নিজের কাজে খুব ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এই চার পাতার পেপারটি তার চিন্তা প্রক্রিয়ায় সম্ভবত কিছু নতুন বিষয় তুলে এনেছিল। পেপারটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করতে তিনি মাত্র দু'তিন দিন সময় নেন এবং তিনি খুব সুপরিচিত গবেষণা জার্নাল Zeitschrift für Physik (সংক্ষিপ্ত নাম Z. Phys) এ পেপার সম্পর্কে খুব ইতিবাচক মন্তব্য সহ পাঠিয়ে দেন। আর Z. Phys ও খুব দ্রুত, আগস্ট মাসের সংখ্যায় পেপারটি (ইংরাজি অনুবাদে শিরোনাম Planck's Law and the Light-Quantum Hypothesis) প্রকাশ করেন। আর সেটাই ছিল খুব স্বাভাবিক কারণ এই পেপারটি পাঠানোর সময় আইনস্টাইনের মন্তব্য ছিল বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন “আমার মতে বোস এখানে যেভাবে (প্ল্যাঙ্কের) সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে রয়েছে এক বিশেষ অগ্রগতির ছাপ। এখানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব উঠে এসেছে। আমি অন্যত্র তা করে দেখাবো”।

আইনস্টাইন তার কথা রেখেছিলেন। তিনি মাত্র মাস দেড়েকের মধ্যে একটি গবেষণাপত্র লিখে ফেললেন যেখানে বিশেষভাবে বোসের পেপারের উল্লেখ রইলো। তারপর তা "অন্যত্র" জমা দিলেন। এখানেও তিনি তার কথা রেখেছিলেন। প্রথমত তিনি তার পেপার প্রকাশনার জন্য তুলে দিলেন Z. Phys নয়, কিন্তু অন্য একটি নামী জার্মান জার্নালে। জার্নালের নাম ইংরাজি তর্জমায় "প্রসিডিংস অব প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস" এবং তার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল আইনস্টাইনের সেই পেপার (ইংরাজিতে নাম Quantum Theory of Monatomic Ideal gases)। এই পেপারে একেবারে গোড়া থেকেই উল্লেখ করা হয়েছে বোসের পেপারের কথা এবং বলা হয়েছে যে বোস যে চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তিনি সেখান থেকে শুরু করে এক পরমাণু বিশিষ্ট আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়েছেন। তার এই গবেষণাপত্রে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল একটি বিশেষ পরিঘটনার সম্ভাব্যতা। তাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট হিসেবে। সে সম্পর্কে বলার আগে বোসের মূল কাজটির তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

আসলে বোস প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি বিকল্প উপস্থাপনা করতে গিয়ে ধরে নিয়েছিলেন যে আলোর কোয়ান্টাম ফোটন তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় কী ধরণের বিন্যাসে থাকতে পারে। এই বিন্যাস ছিল প্রথাগত ও পরিচিত সনাতনী বিন্যাস (যা দুই বিজ্ঞানীর নামানুসারে ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজম্যান বিন্যাস নামে পরিচিত) এর থেকে ভিন্ন। বোসের এই কাজটি ফোটনের জন্য একেবারে নিখুঁত ছিল কারণ ফোটন হচ্ছে অখন্ড স্পিন বিশিষ্ট একটি কণিকা। আইনস্টাইন বোসের কাজটি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখালেন যে কেবল ফোটন নয় অখন্ড স্পিন বিশিষ্ট যে কোন কণার ক্ষেত্রে এই বিশেষ বিন্যাসটি প্রযোজ্য। তাই এই বিশেষ সংখ্যায়নের নাম হ'ল বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন। এটিই প্রথম কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিক্স। এর বছর দেড়েকের মধ্যেই পাওয়া গেল যেসব কণিকার স্পিন অখন্ড নয় এমন কণিকারা এই স্ট্যাটিসটিক্স মেনে চলে না কারণ একই শক্তি স্তরে তাদের একটির বেশি কণিকা থাকতে পারে না। এই ধরণের কণিকারা (যাদের স্পিন একই এককে অখন্ড সংখ্যা নয় বরং যাদের প্রকাশ করা যাবে 1/2, 3/2, 5/2 প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে, একই এককের ওপর ভিত্তি করে) সেই কণিকারা মেনে চলে ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন।

পরবর্তীকালে এই দুটি সংখ্যায়ন পরিচিত হয়েছে যথাক্রমে কেবল বোস স্ট্যাটিসটিক্স আর ফার্মি স্টাটিসটিক্স নামে। তার একটা কারণও রয়েছে। যে কণিকারা বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের নামকরণ হয়েছে বোসন আর যারা অন্য কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হচ্ছে ফার্মিয়ন। এখন আমরা জানি যে ফোটন ছাড়া ডব্লিউ ও জেড বোসন, আলফা কণা, গ্লুওন, এবং অবশ্যই হিগস বোসন এবং মহাবিশ্বের হয়ত বা অর্ধেক কণিকা বোসন। তারা মেনে চলে বোস সংখ্যায়ন। অন্যদিকে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউট্রিনো প্রভৃতি কণিকারা ফার্মিয়ন এবং তারাও দলে সম্ভবত একইরকম ভারী। দু দলকে ঠিক আধাআধি বলা যাবে না কিন্তু দু দলেরই কণিকা সংখ্যা সম্ভবত তুল্যমূল্য। এক দলকে অন্য দলের তুলনায় খাটো বা পিছিয়ে পড়া বলা যাবে না।

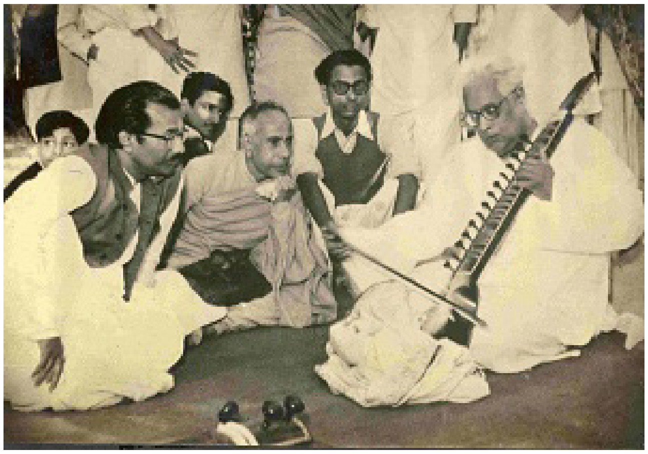

এস্রাজ বাদনরত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আইনস্টাইন 1924 সালের জুলাই মাসের 2 তারিখে বোসের চিঠির জবাব দেন। সেই দিনই তিনি পেপারটির জার্মান তর্জমা সেরে জার্নালে জমা দিয়েছেন। বোসের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করে আইনস্টাইন একটি পোস্টকার্ড পাঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোসের কাছে, এই পোস্টকার্ডের ফটো এখানে দেওয়া হল। এই চিঠিটি ছিল একাধারে বোসের পত্রপ্রাপ্তির স্বীকৃতি, অন্যদিকে সেখানে ছিল বোসের কাজের প্রসংশা। চিঠিটি বোসের জীবনে পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল এক সার্টিফিকেট আর এক বিশেষ সুপারিশপত্র হিসেবে; কারণ আইনস্টাইনের ওই চিঠির ওপর ভিত্তি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোসকে একটি বিশেষ স্কলারশিপ দেয়। উদ্দেশ্য, বোস ইওরোপে গিয়ে একেবারে প্রথম সারির গবেষণাগারে কাজকর্ম দেখবেন, প্রশিক্ষণ নেবেন ও তার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য গড়ে তুলবেন উপযুক্ত পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার। এই স্কলারশিপের ওপর ভিত্তি করে 1924 সালের অক্টোবর মাসে বোস ফ্রান্সে উপস্থিত হন।

এবার সংক্ষেপে বলা যাক, কি এই বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট। খুব সহজ করে বললে বলা যায় যে এটি পদার্থের একটি সম্ভাব্য অবস্থা। আমাদের জানা পদার্থের চারটি অবস্থার রয়েছে। কঠিন, তরল এবং গ্যাস আমাদের খুব পরিচিত। এর পরে উচ্চ তাপমাত্রায় মেলে আর এক অবস্থা যার নাম প্লাজমা। এবার তত্ত্বগত ভাবে উঠে এলো আরেকটি সম্ভাব্য অবস্থার কথা যাকে বলা যেতে পারে কিছু পরমাণু নিয়ে চরম শূন্য তাপমাত্রার অতি নিকটে লভ্য একটি বিশেষ অবস্থা। এখানে পরমাণুগুলি অবস্থান করবে তাদের ন্যূনতম কোয়ান্টাম শক্তির স্তরে। একে বলা হয়েছে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা। পরীক্ষামূলকভাবে এই অবস্থার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় অতি নিম্ন তাপমাত্রার এবং অতি নিম্নচাপের। আইনস্টাইনের অন্য কাজের মত এটিও ছিল এক জটিল গাণিতিক কাজ এবং সেই সময় ওই তত্ত্ব পরীক্ষা করে দেখার উপায় ছিল না। কারণ তার জন্য প্রয়োজন ছিল অতি নিম্ন তাপমাত্রা (প্রায় চরম শূন্যের কাছাকাছি) আর খুব উচ্চ মাত্রার বায়ুশূন্য অবস্থা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি। তাই পদার্থবিদদের অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রযুক্তির উপযুক্ত পর্যায়ের উত্তরণের জন্য। অনেক পরে; যখন কেবল

একাদশ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা

নকুল পারাশর

অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা একটা অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছি। আজকের দিনে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'ব্যবসায়িক লাভের' পথে চলছে এবং আদর্শবাদকে প্রায়শই মনে করা হয় 'বোকাদের' অবলম্বন। এই পরিস্থিতিতে সবথেকে বেশি মনে পরে স্বামী বিবেকানন্দের কথা যিনি চেয়েছিলেন, তাঁর দেশবাসী "মানুষের মতো মানুষ" হোক।

স্বামীজি তাঁর দেশবাসীর অগ্রগতির পথে দুটি স্বতন্ত্র সমস্যা চিহ্নিত করেছেন--একটি ব্যাপক দারিদ্র্য এবং অন্যটি শিক্ষার অভাব। দারিদ্র্য মর্যাদা কেড়ে নেয় এবং স্বামীজী বারবার দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলেছেন। স্বামীজির কাছে শিক্ষার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি কারণ উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া একজন মানুষ তার সংবেদনশীলতা হারায় এবং তার নিজেকে চেনা হয়ে ওঠে না। স্বামীজির কাছে শিক্ষার অর্থ ছিল মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণতার প্রকাশ। শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে সামগ্রিক এবং চরিত্র-নির্মাণের সহযোগী। শিক্ষা হবে প্রাচ্যের সংশ্লেষণ এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণের মিলিত রূপ।

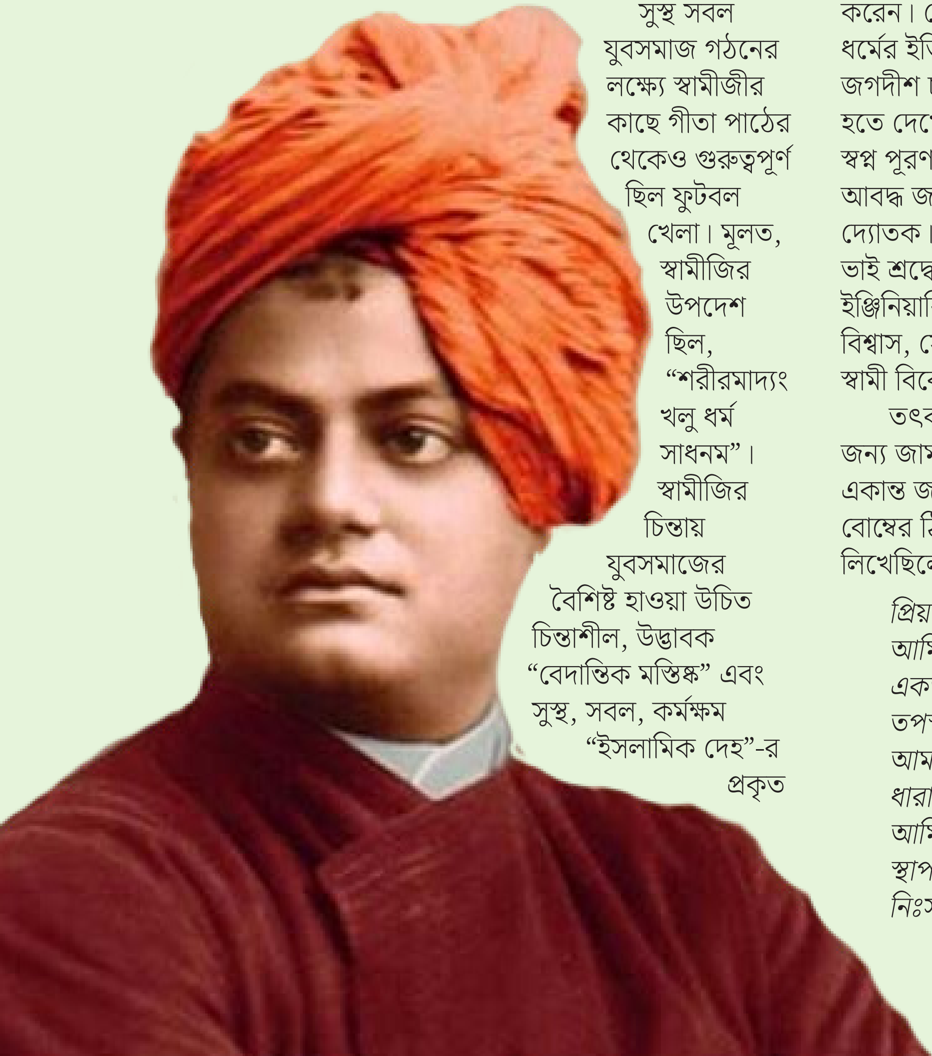

সুস্থ সবল যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে স্বামীজীর কাছে গীতা পাঠের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফুটবল খেলা। মূলত, স্বামীজির উপদেশ ছিল, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম"। স্বামীজির চিন্তায় যুবসমাজের বৈশিষ্ট হাওয়া উচিত চিন্তাশীল, উদ্ভাবক "বেদান্তিক মস্তিষ্ক" এবং সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম "ইসলামিক দেহ"-র প্রকৃত মেলবন্ধন। সুস্বাস্থ্য ছাড়া সঠিক শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রম করা কার্যত অসম্ভব। স্বামীজি চেয়েছিলেন তাঁর দেশের যুবক-যুবতীরা সুস্থ ও সাহসী হয়ে উঠুক। ইতিহাসের সেই সময়কালে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সম্ভবত একটি সুস্থ শরীর ছিল প্রাথমিক চাহিদা। 1911 সালে খেলা ফুটবল ম্যাচে ভারতীয়রা খালি পায়ে খেলে বুট পরা ইংরেজদের পরাজিত করেছিল, সেটি ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয়দের জন্য একটি গৌরবময় মুহূর্ত। পরাধীন জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা এই ঘটনার মধ্যে আমি স্বামীজীর প্রভাব খুঁজে পাই।

স্বামীজীর মন ছিল সব রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধে এবং জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের নানা উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় ভরা। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম এবং অবদানের প্রশংসা করেছিলেন এবং তার দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। 1900 সালে জগদীশ চন্দ্র বসু প্যারিস প্রদর্শনীতে "আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ কংগ্রেসে" ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে ছিলেন এবং ধর্মের ইতিহাসের একটি সম্মেলনে অংশ নিচ্ছিলেন। স্বদেশবাসী জগদীশ চন্দ্র বসুকে প্যারিসে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে প্রশংসিত হতে দেখে স্বামীজি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। এটা ছিল তার স্বপ্ন পূরণ। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে পরাধীনতার জালে আবদ্ধ জাতির মধ্যে এই উত্তরণ তার কাছে ছিল নবজাগরণের দ্যোতক। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে স্বামীজি তার ছোট ভাই শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্তকে আইন ছেড়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই সময়ে পাশ্চাত্যে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছিল স্বামী বিবেকানন্দ তার খোঁজখবর রাখতেন।

তৎকালীন ভারতে একটি বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জামশেদজি টাটার চিন্তা-ভাবনার কথা স্মরণ করা একান্ত জরুরি। 23 নভেম্বর, 1898-এ এসপ্ল্যানেড হাউস, বোম্বের ঠিকানা থেকে জামশেদজি টাটা স্বামীজিকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার বঙ্গানুবাদ:

প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ,
আমি বিশ্বাস করি আপনি জাপান থেকে শিকাগো ভ্রমণে একজন সহযাত্রী হিসাবে আমাকে মনে আছে। ভারতে তপস্বী চেতনার বিকাশ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে, এবং আমি চাই এই ধারাটি জীবনের মূল ধারার সাথে যুক্ত হোক। আমি দেশের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার সাথে এ বিষয়ে আপনার নিঃসংশয় ধারণাগুলির মিল খুঁজে পাই। আমার মনে

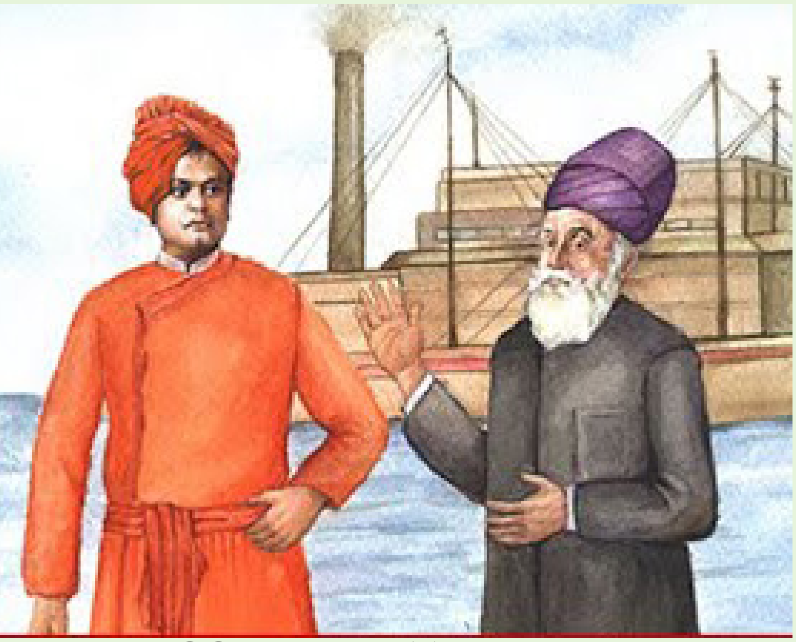

স্বামীজী এবং জামশেদজি টাটা

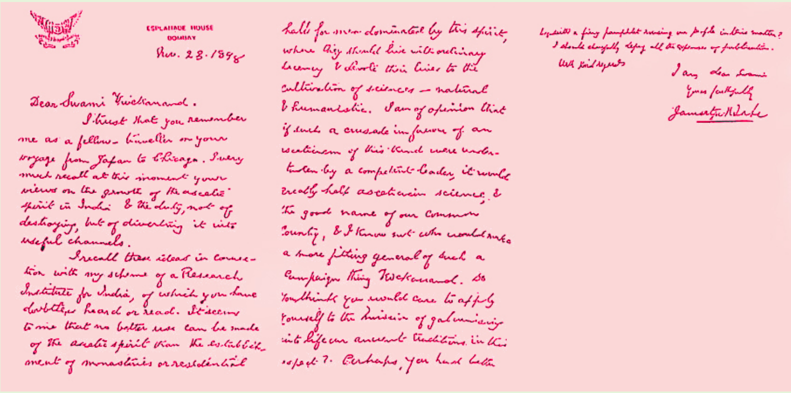

ESPLANADE HOUSE
BOMBAY
Nov. 23. 1898

Dear Swami Vivekanand.
I trust that you remember me as a fellow-traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India & the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.
I recall these ideas in connection with my scheme of a Research Institute for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordinary decency & devote their lives to the cultivation of sciences — natural & humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science, & the good name of our common country, & I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekanand. Do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps, you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter? I should cheerfully defray all the expenses of publication.
With kind regards
I am, dear Swami
Yours faithfully
Jamsetji N. Tata

স্বামীজীকে লেখা জামশেদজি টাটার চিঠি

হয় যে মঠ বা আশ্রমের মতো পবিত্র ও নির্লোভ জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক এবং মানবতাবাদী-- উভয় ধারার বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করা উচিত। আমি মনে করি যে, অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে দেশের গৌরবকে তুলে ধরার এই যুদ্ধে একজন সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষের প্রয়োজন এবং এই কাজে বিবেকানন্দের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির কথা আমার জানা নেই। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে দিয়ে আমাদের জীবন গ্যালভানাইজ করার এই মিশনে আপনি কি নিজেকে যুক্ত করতে চান? সম্ভবত, আপনি এই বিষয়ে জনগণকে উজ্জীবিত করার মত একটি জাজ্বল্যমান প্রচারপত্র দিয়ে এর শুরু হতে পারে। আমি আনন্দের সাথে প্রকাশনার যাবতীয় খরচ বহন করব।

ধন্যবাদান্তে,
আমি প্রিয় স্বামীজি
তোমার বিশ্বস্ত
জামসেদজি এন টাটা

এই চিঠির দুটি শব্দ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: প্রাকৃতিক এবং মানবতাবাদী। শুদ্ধ বিজ্ঞান হল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা জীববিজ্ঞানের বিষয় বা প্রকৃতির রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা। মানুষের সুবিধার জন্য প্রকৃতিকে জয় করার প্রচেষ্টা অধ্যয়ন হল ফলিত বিজ্ঞান। মানুষ এবং প্রকৃতির এই আন্তঃসম্পর্ক একটি জটিল বিষয় এবং ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। মানবতাবাদী নীতির দাবি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল, কুফল এবং মূল্যবোধের বিষয়গুলিকে অবশ্যই পাঠক্রমভুক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও সমাজের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কেও সচেতন হয়। যেমন পারমাণবিক বা জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র বিজ্ঞানের দান হলেও সভ্যতার জন্য বিপর্যয়ের হুমকি। স্বামীজী কখনই বিজ্ঞানের এই দিকটিকে অনুমোদন করতেন না যেখানে সার্বিক ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। এখানেই পশ্চিমা চিন্তাধারাকে কমিয়ে আনা দরকার এবং স্বামীজীর মানবতাবাদী নীতিগুলিকে আরো বেশি করে অনুসরণ করা দরকার।

পাশ্চাত্য দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নিযুক্ত রয়েছে এবং তাতে জগতের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারও নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। ছিল বহু দেশে উপনিবেশ গড়ে ওঠার ইতিহাস। প্রযুক্তির কুৎসিত চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। স্বামীজী পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত শিক্ষার এই তির্যক দিকটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মূল্যবোধ জাগাতে প্রাচ্যের দর্শন পাঠ্যসূচিতে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রত্যাখ্যান ছিল না। এই পটভূমিতে প্রাচ্যের সম্প্রীতি এবং শুভবুদ্ধির ধারণা প্রয়োজন ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ঋষিদের মতোই সেই কাজটি সম্পাদন করেছিলেন। তার মন্ত্র ছিল, “সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ”।

স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাকে অতীন্দ্রিয় আলো অনুভব করতে সাহায্য করেছিলেন যা ছিল সমস্ত বিভাজিত আলোর একীকরণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য দেবত্ব স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়-চেতনায় একটি নতুন অর্থ পেয়েছে। আজ সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলছে। স্বামীজি এত বছর আগে জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামগ্রিক। এইভাবে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একত্রিত ককরে এক নতুন দর্শনের মাধ্যমে জাতির সার্বিক উন্নয়নের সূচনা করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি জনপ্রিয় বই “প্রাচ্য ও পাশ্চত্য”। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে দীনেশ চন্দ্র সেনের কাছে বইটির শৈলী, ভাষা এবং বিষয়বস্তুর প্রশংসা করেছিলেন। বইটিতে কিছু ছোট প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে স্বামীজী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে, স্বামীজি লিখেছেন: “ব্যাতন না জানলে ভদ্র অভদ্র বুঝবো ক্যামনে?” তার বক্তব্যে শ্লেষ ছিল। সেসময় কৃষি অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিল। নতুন বেতনভোগী শ্রেণী উঠে আসছিল। তাদের সামাজিক সম্মান ছিল তাদের বেতন নির্ভর! স্বামীজী এখানে সমাজ ও সভ্যতার দ্বিধাবিভক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় বাইরের আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না, ছিল অন্তরের সম্পদের তত্ত্বতালাশ, ক্ষণস্থায়ী সম্পদ থেকে শাশ্বত সম্পদের প্রতি আগ্রহ। স্বামী বিবেকানন্দ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তিনি পাশ্চাত্য প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং মানব জীবন ও সভ্যতায় পরিবর্তন আনার জন্য এর দক্ষতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভারতের নিজস্বতা, যা এই ভূখণ্ডের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে, সেই মানবিক চরিত্র কখনই হারানো উচিত নয়।

স্বামীজীর চেতনাকে আমরা কতটুকু বাস্তবায়িত করতে পেরেছি তার আশু মূল্যায়ন প্রয়োজন। আমরা কি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একত্রিত করতে পেরেছি? এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সেরা দুই 'জগতের' মিলন। কতটুকু অর্জিত হয়েছে? স্বামী বিবেকানন্দ এমন তরুণ সমাজ চেয়েছিলেন যাদের সুস্থ মন এবং আত্মার আধার হবে বলিষ্ঠ দেহ, যাদের সেবা দেশ ও জাতির উন্নতিসাধন করবে। আমরা কি তা অর্জন করতে পেরেছি? আমাদের সকলকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। স্বামীজী একজন দেশপ্রেমিক এবং জাতি গঠন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তার ভূমিকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। আজকের দিনে দেশের চেহারা বদলে দিতে পারে এমন চরিত্রবান মানুষের সংখ্যা কি খুব বেশি? এ প্রসঙ্গেও চিন্তা-ভাবনা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের সর্বোত্তম পরিষেবা দেওয়ার জন্য মাথা, হৃদয় এবং হাত একত্রিত করার বিষয়ে বাগ্মী ছিলেন। মা ও মাতৃভূমি স্বামীজীর কাছ থেকে একই সম্মান ও আরাধনা পেয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

স্বামীজীর প্রয়ানের এক শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও আজ তাঁর শিক্ষা ভাবনা ও বিজ্ঞান চেতনা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর দর্শন অনুসরণ করার প্রয়োজনীতা প্রশ্নাতীত। সমাজের সার্বিক জাগরণে তাঁর বিখ্যাত উক্তি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" আমাদের আজও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে পাথেয় করে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতিই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ। ●

*লেখক **ডঃ নকুল পারাশর** শান্তি ফাউন্ডেশনের মূল কর্মাধ্যক্ষ।*
ইমেল: nakul.parashar@gmail.com

অষ্টম পৃষ্ঠার পর ...

তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় আগ্রহী হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে দেওয়া স্কলারশিপের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করে পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদ্যার নানা গবেষণাকাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন।

আইনস্টাইন নন সত্যেন্দ্রনাথও প্রয়াত হয়েছেন তখন এই কাজটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। গত শতকের শেষ দশকে এই কাজ করার জন্য 2001 সালে পদার্থবিদ্যার নোবেলে ভূষিত হন তিন বিজ্ঞানী। তাদের নোবেল ঘোষণাপত্রে উল্লেখ ছিল বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেটের। আবারও বোসের অবদান উঠে এসেছিল নোবেলের মঞ্চে।

ফিরে আসা যাক বোসের ইওরোপের অভিজ্ঞতার বিষয়ে। 1924 এর অক্টোবর থেকে পরবর্তী দু'বছরে বোস ইওরোপের বিভিন্ন শহরে সেই সময়কার একেবারে প্রথম সারির বিজ্ঞাণীদের গবেষণাগারে কিছুটা করে সময় অতিবাহিত করেন। এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন, মেরি কুরি, লুই ডি ব্রগলি, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, পল ল্যাজভ্যাঁ, ম্যাক্স বর্ন প্রভৃতিরা। তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় আগ্রহী হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে দেওয়া স্কলারশিপের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করে পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদ্যার নানা গবেষণাকাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। আইনস্টাইনের সঙ্গে বার্লিনে বোস অবশ্যই দেখা করেন কিন্তু তা ইওরোপে পৌঁছানোর এক বছর পরে 1925 সালের অক্টোবরে। তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল তা খুব বিস্তৃতভাবে বোস জানান নি। তবে ইঙ্গিত ছিল যে আইনস্টাইন বোসের কাছে প্রথাগত কিছুর বাইরে আরও নতুন চিন্তা আশা করছিলেন। তাই সেই অর্থে বোস তার সেই সময়কার চিন্তাভাবনা দিয়ে আইনস্টাইনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তাই তাদের যৌথ অবদানের আর সুযোগ তৈরি হয় নি। কিন্তু যে অবদান বোস রেখে গেছেন এবং তার যে চিন্তার ওপর ভিত্তি করে এক শ্রেণির মৌল কণিকার উপযুক্ত সংখ্যায়ন গড়ে উঠেছে তা বিজ্ঞানের সম্ভবত এক চিরস্থায়ী সম্পদ। আইনস্টাইন অবশ্যই এক জহুরী কিন্তু বোস যে নিঃসন্দেহে এক অতি উচ্চমানের হীরকখন্ড তার পরিচয় একশ বছর পরেও অম্লান।

সকলেই জানেন যে সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ কেবল পদার্থবিদ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে নি, সাহিত্য, ভাষা, সঙ্গীত নানা বিষয়ে ছিল তার অবাধ বিচরণ। আমাদের দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন তিনি। 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তিনি স্থাপনা করেছেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান যা পঁচাত্তর বছরে পা রাখলো 2023 সালে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের যে প্রয়াস আজ আমাদের নজরে আসে তার দিশা যারা দেখিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস তাদের অন্যতম। ●

*লেখক **ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী** কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabhu@gmail.com

জলাভূমি জলাশয় নিয়ে কিছু কথা

মোহিত রায়

জলাভূমি নিয়ে দেশে এখন বেশ আলোচনা হয়, কিন্তু জলাশয় নিয়ে তেমন নয়। জলাভূমি কথাটার বয়স বেশী নয়। Wetland এর বাংলা করা হল জলাভূমি। 1971 সালে ইরানের রামসার শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় যার নাম ছিল Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat। এই প্রথম সরকারি স্তরে ওয়েটল্যান্ড শব্দটি ব্যবহৃত হল, এর আগে পরিবেশের আলোচনাতেও ওয়েটল্যান্ড শব্দটির উল্লেখ প্রায় পাওয়াই যায় না। এই সম্মেলনের পর জলাভূমি বাঁচাতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হল যার নাম রামসার কনভেনশন।

বাংলা অভিধানে জলাভূমি কথাটা ছিল না। বাংলায় জলা, বাদা, বিল, হাওর এসব শব্দই ব্যবহৃত হয়। শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'জলা'র অর্থে লেখা আছে—জলমগ্ন নিম্নভূমি ও বিল। সুতরাং জলা কথাটিই যথেষ্ট ছিল মনে হয়। রামসার কনভেনশনের জলাভূমির সংজ্ঞা "areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres." এই সংজ্ঞায় সব ধরণের, স্থায়ী বা অস্থায়ী, জলের উপস্থিতিকেই জলাভূমি বলা হল। এক অর্থে খাল বিল পুকুর জলা ধানক্ষেত, নদী—মানে কিছুই বাদ দেওয়া হল না। ফলে আমাদের নিত্য ব্যবহারের পুকুরটি জলাশয় থেকে হয়ে গেল জলাভূমি। এখন পুকুর থেকে স্নান করে উঠে আসা কাউকে যদি বলি আপনি কতদিন এই জলাভূমিতে স্নান করছেন, তিনি নিশ্চয় দারুণ ভড়কে যাবেন—বলবেন ভূমি কোথায় পেলেন মশাই, এতো শুধুই জল। জলা বা বিল বলতে বোঝায় যেখানে অনেকাংশে সব সময় জল থাকে না, বর্ষার জল বা জোয়ারের জল সরে গেলে মাঠ জেগে ওঠে, সেখানে কখনো জঙ্গল, ঝোপঝাড় হয়, চাষবাস হয় আবার জল এলে জলে অনেকটাই ডুবে যায়। জলা বলতে আমরা আরো বুঝি একটি প্রাকৃতিক সৃষ্টি, মানুষের তৈরী কিছু নয়। ফলে পুকুর, দীঘি বা মাছের ভেড়ীকে, যেখানে সব সময়ই জল থাকে তাকে জলা বা জলাভূমি বললে অস্বস্তি হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক গন্ধ থাকায় জলাভূমিই গুরুত্ব পেল।

1979 সালে U.S Fish and Wildlife Service এর সংজ্ঞাটি তুলনামূলক পরিষ্কার। এতে বলা হয়েছে—"জলাভূমি স্থল থেকে জলের মাঝামাঝি একটি পরিবর্তনশীল অঞ্চল

যেখানে জলতল সাধারণতঃ মাটির কাছাকাছি থাকে বা মাটি যেখানে অগভীর জলে ঢাকা থাকে"। এর সঙ্গে তিনটি শর্তের উল্লেখ আছে যার অন্ততঃ একটি পালনীয়—১) অঞ্চলটি সবসময় বা বর্ষার সময় অন্ততঃ সাতদিন জলমগ্ন থাকে; ২) অঞ্চলটিতে বছরের কিছু সময় জলজ উদ্ভিদ থাকে; ৩) অঞ্চলটির মাটি মূলত জল সম্পৃক্ত, ফলে এর উপরি স্তরের মাটিতে অক্সিজেনের অভাব (anaerobic) থাকে।

ভারত সরকার প্রথম জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) 2010 বিধি প্রণয়ন করে। এটি সংশোধিত হয়ে জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) 2017 বিধি প্রণীত হয়েছে। এই আইনে জলাভূমির একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয় যা মূলতঃ রামসার কনভেনশন সংজ্ঞার অনুকরণ; কেবল এতে ধানক্ষেত, নদী ও উপকূলবর্তী জলাভূমি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আইনে জলাভূমির আয়তনের কথা বলা নেই। জলাভূমি বলতে বোঝায়—"একটি অঞ্চল যা বিল, ফেন, পিটল্যান্ড, ও জল, প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত, স্থায়ী বা সাময়িক, যাতে জল স্থির বা চলমান, নির্মল, তিক্ত বা নোনা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রের যে অংশ যে অংশে ভাটার সময় ছয় মিটারের বেশী জলের গভীরতা থাকে না। কিন্তু নদীপথ, ধানক্ষেত এবং মনুষ্য সৃষ্ট পানীয় জলের জন্য জলাশয় এবং মৎস্য চাষ, লবণ তৈরী ও সেচের জন্য জলাশয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।" ("wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes;)।

এই আইনে আরো বলা হল যে এই আইন কেবলমাত্র রামসার জলাভূমি ও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ঘোষিত জলাভূমিগুলিতেই প্রযোজ্য হবে। দেশে ঘোষিত এরকম জলাভূমির সংখ্যা 115টি, পশ্চিমবঙ্গে 6টি।

1975 সালে রামসার কনভেনশন আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত হবার পর সমগ্র বিশ্বেই গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলিকে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ শুরু হয়। এখন বিশ্বে 2502টি রামসার স্বীকৃত জলাভূমি রয়েছে, ভারতে রয়েছে 75টি। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে দুটি—সুন্দরবন জলাভূমি এবং পূর্ব কলকাতা জলাভূমি।

মানব সভ্যতা বিস্তার করেছে প্রকৃতিকে অনেকটা নিজের প্রয়োজনে ধ্বংস করেই। অরণ্য কেটে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, ভূমি কর্ষণ করেই গড়ে উঠেছে গ্রাম, নগর, শস্যক্ষেত্র। তেমনই জলাভূমি বুজিয়েই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বিখ্যাত শহরগুলি—লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভেনিস, নিউ ইয়র্ক, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ওয়াশিংটন ইত্যাদি। কলকাতা শহরও গড়ে উঠেছিল জলা বাদা বুজিয়েই। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বর্ণনায় "যে সকল স্থান বর্তমান সময়ে শিয়ালদহ ও বউবাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ সেসমস্ত স্থান পর্যন্ত লবণ জলের হ্রদটি বিস্তৃত ছিল"। লবণ জলের হ্রদটি

ছিল কলকাতার পূর্ব প্রান্ত জুড়ে বিশাল জলা খাল আর নদীর এক সমাহার। জোয়ার ভাঁটা খেলা নোনা জলের বিদ্যাধরী নদীর প্লাবনভূমি ছিল এই বিশাল জলা অঞ্চল। জলা বুজিয়ে কলকাতার বিস্তার কিন্তু নতুন কিছু নয়। পরিবেশ সংগঠন—পাবলিক–পিপল ইউনাইটেড ফর বেটার লিভিং ইন ক্যালকাটা, বনানী কক্করের নেতৃত্বে 1992র জানুয়ারীতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণের বিরুদ্ধে ও জলাভূমি বাঁচানোর জন্য মামলা করে। 1992-র সেপ্টেম্বরে কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে অঞ্চলটি পূর্ব কলকাতার আবর্জনা পুনশ্চক্রায়ন অঞ্চল বা Waste Recycling Region ঘোষণা হল ও এই অঞ্চলটিতে কোন নতুন উন্নয়ন কার্যক্রম নিষিদ্ধ হল। পরে এই অঞ্চলটি পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নামে পরিচিত হল। এখন এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ তৈরী হয়েছে—East Kolkata Wetland Management Authority. এছাড়া এটি এখন আন্তর্জাতিক রামসার জলাভূমি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কিন্তু জলাভূমির সংজ্ঞায় অস্পষ্টতা থাকায় তা প্রয়োগে সমস্যাও হচ্ছে। পরিবেশবাদী উৎসাহে আদালতে ঘোষিত পূর্ব কলকাতার আবর্জনা পুনশ্চক্রায়ন অঞ্চল বা Waste Recycling Region পরে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নামে পরিচিত হল। এর মোট আয়তন 12500 হেক্টর, যার মধ্যে জলা 5852 হেক্টর (47%), কৃষি ক্ষেত্র 5321 হেক্টর (46%) এবং বাকিটা বসবাসের অঞ্চল। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, যে জলাভূমির 40% স্রেফ কৃষি ক্ষেত্র এবং জলের অঞ্চলটি মাছের ভেড়ী, তাকে আদৌ জলাভূমি বলা যায় কিনা এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটি কেউ তুলতে সাহস পান না। ভারত সরকারের 2017 সালের জলাভূমি নিয়ম অনুযায়ী কৃত্রিম ভাবে তৈরি মাছ চাষের অঞ্চলকে জলাভূমি বলা যায় না। একদা প্রাকৃতিক লবণ হ্রদ আজ আর কোন প্রাকৃতিক জলা নয়, ব্যবসায়িক মাছ চাষের জন্য অনেক ছোট বড় আলে ভাগ করা ভেড়ী। এইসব ভেড়ী খুব অগভীর, কয়েক ফুট জল, ফলে কয়েকটি বিশেষ ধরণের মাছের চাষই হয়। প্রাকৃতিক জলাশয়ের জীব বৈচিত্র্য এখানে কম। নিয়মিত জল সরিয়ে এগুলির তলদেশ পরিস্কার করা হয়, তাতে রাসায়নিক প্রয়োগ হয়, মাছ চাষে প্রয়োজনীয় সব ধরণের খাবার দেওয়া হয়। সুতরাং এই জলাশয়গুলি আর প্রাকৃতিক জলাশয় নয়। সুতরাং এই জলা অঞ্চলটি জলাভূমির সংজ্ঞায় সম্ভবতঃ আর গণ্য হওয়া উচিত নয়। রামসার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির শুধু ভেড়ীগুলি নয়, কৃষি জমিগুলিও জলাভূমির সরকারী আইনের ছাপ পেয়ে গেছে যেটি যথার্থ নয়। এর ফলে এখানের মহানগরের গায়ে লাগা কৃষি জমিগুলিতে আর নগরায়ণের সুযোগ থাকছে না। এর ফলে মালিকেরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং বেআইনি নগরায়ন ঘটে চলেছে।

এবার আসা যাক জলাশয়ের কথায়। জলাশয়ের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশে তেমন কোন আইন কানুন নেই। দেশের সবচেয়ে বেশী জলাশয় আছে পশ্চিমবঙ্গে, সেখানেও তেমন আইন কিছু নেই। 1993 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইনল্যান্ড ফিসারিস আইনে সংশোধন করে, তাতে (2008এর সংশোধন) বলা হল শহর অঞ্চলে যে কোন জলাশয় ও পঞ্চায়েত অঞ্চলে পাঁচ কাঠার (350 বর্গ মিটার) বেশী কোন জলাশয়কে (ওয়াটার এরিয়া) আর বোজানো যাবে না। জলাশয় মানে বলা হল যেখানে অন্তত বছরে 6 মাস জল থাকে। কিন্তু এই সংরক্ষণের একমাত্র লক্ষ হল মাছ চাষ। কিন্তু জলাশয়ের গুরুত্ব বহুমুখী—স্নান, গার্হস্থ বিভিন্ন কাজ, ধর্মীয় প্রয়োজন, স্থানীয় আবহাওয়া, সামাজিক ব্যবহার, গাছপালা, পাখী, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি। কলকাতা পুরসভা অঞ্চলেই রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার জলাশয় যা প্রায় রোজ 10 লক্ষ মানুষ ব্যবহার করেন। কিন্তু এর ব্যবস্থাপনা বা সংরক্ষণের কোন বিশেষ উদ্যোগ নেই।

2023 সালে ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রক সমগ্র দেশের Water Bodies 1st Census Report প্রকাশ করেছে। যদিও এই Water Bodies বা জলাশয়ের সংজ্ঞা যেখানে প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট ভাবে জল ধরা আছে কিন্তু কোন আয়তন বলা নেই। এতে সারা দেশে 24,24,540টি জলাশয় আছে বলা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বেশী জলাশয় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, 7,47,480 (30.8%)। তবে এই বিশদ রিপোর্টটির তথ্য সম্পর্কে এই নিবন্ধ লেখকের যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে।

*লেখক **ডঃ মোহিত রায়** একজন পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদ এবং লোকবিজ্ঞান পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: mohitkray@gmail.com

আগাম ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় মিচাং বা মিগজাউম চলে গেছে; হানা দিয়েছিল গত 3রা ডিসেম্বর; বন্যায় ভাসিয়ে দিল দক্ষিণ ভারতের একাংশ; নির্মমভাবে নিয়ে গেল প্রায় 17টি প্রাণ; দিয়ে গেল অব্যক্ত বিপর্যয়! এবং আগামীতে "রেমাল" আঘাত হানার জন্য ভ্রুকুটি করছে। কবি হয়তো ঠিকই বলেছেন,

ঝোড়ো হাওয়া করছে খেলা
সঙ্গে মাতাল বৃষ্টি
এমন যদি চলতে থাকে
কেমনে হবে সৃষ্টি!

স্বাভাবিকভাবেই যেন আজকাল গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের সাধারণ মানুষের জীবনকে আঘাত করা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘূর্ণিঝড়গুলি এত শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে তার প্রতিরোধে অনেক সতর্কতা প্রয়োজন।

'গ্রীষ্মমন্ডলীয়' বলতে এই ঝড়ের ভৌগলিক উৎপত্তিকে বোঝায় যা একচেটিয়াভাবে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের মতো গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলাঞ্চলের উপর তৈরি হয়। সাধারণত, এই ঝড়গুলি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ, জাপান, চীন, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, পালাউ, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, টুভালু, ও এমনকি মাইক্রোনেশিয়া, পলিনেশিয়া এবং আরও অনেক জায়গায় আঘাত হানে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, প্রতিটি ঝড়কে শনাক্ত করার জন্য বিশেষভাবে প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের পৃথক নামকরণ প্রয়োজন। একটি ঘূর্ণিঝড়ের নির্দিষ্ট নামকরণ ওই ঘূর্ণিঝড়টিকে সংখ্যা এবং প্রযুক্তিগত পদের সাহায্যে চিহ্নিত করার চেয়ে সহজ এবং সহজেই তা মনে রাখা যায়। মিডিয়া কভারেজের জন্যও এটি খুবই সহজ এবং উপযোগীও বটে। এই বিশেষ নামকরণ সচেতনতা তৈরি করতে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর প্রয়োজনীয় বিকাশের উপর তথ্য প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

এইরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য, বিশ্বব্যাপী ছয়টি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিশেষায়িত আবহাওয়া কেন্দ্র বা 'রিজিওনাল স্পেশালাইজড মেটিওরোলজিক্যাল সেন্টারস্' (RSMCs) এবং ছয়টি সংশ্লিষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র বা 'ট্রপিক্যাল সাইক্লোন ওয়ার্নিং সেন্টারস্' (TCWCs) রয়েছে, যেগুলো ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়াও, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা 'ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন' (WMO) এবং এশিয়া ও প্যাসিফিকের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক আয়োগ বা 'দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড স্যোশাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' (ESCAP) যৌথভাবে 1972 সালে একটি আন্তঃসরকারী সংস্থা হিসাবে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত প্যানেল 'দ্য প্যানেল অন ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস্' (PTC) প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে RSMCs এবং TCWCs দ্বারা প্রদত্ত নামগুলি PTC-এর অনুমোদনে সংশোধন এবং চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের নাম সংক্ষিপ্ত, সহজে বলা যায় এমন এবং সর্বোচ্চ আটটি অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া উচিত। এইসব নামকরণ কোন ব্যক্তির বিশ্বাস, লিঙ্গ, রাজনীতি, ধর্ম বা অন্য কোন আপত্তিকর অনুভূতির উপর ভিত্তি না করে বা কোনপ্রকার আঘাত না দিয়ে ঠিক করা উচিত বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'রিজিওনাল স্পেশালাইজড মেটিওরোলজিক্যাল সেন্টারস্' (RSMCs) এর নামগুলো হলো, যথা—

১. আঞ্চলিক বিশেষায়িত আবহাওয়া কেন্দ্র, নাদি-ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কিত ফিজি আবহাওয়া পরিষেবা।
২. দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগর অঞ্চল সম্পর্কিত, আরএসএমসি লা রিইউনিয়ন-ট্রপিক্যাল সাইক্লোন সেন্টার/মেটিও ফ্রান্স।
৩. বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর অঞ্চল সম্পর্কিত ট্রপিক্যাল সাইক্লোনস্ নিউ দিল্লি/ভারত আবহাওয়া বিভাগ।
৪. পশ্চিম-উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চল সম্পর্কিত টোকিও টাইফুন কেন্দ্র/জাপান আবহাওয়া সংস্থা।

৫. মধ্য-উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কিত হনুলুলু হারিকেন কেন্দ্র।
৬. ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, উত্তর আটলান্টিক এবং পূর্ব-উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল সম্পর্কিত জাতীয় হারিকেন কেন্দ্র বা মিয়ামি হারিকেন সেন্টার।

আর সংশ্লিষ্ট ছয়টি 'ট্রপিক্যাল সাইক্লোন ওয়ার্নিং সেন্টারস্' (TCWCs) এর নাম রয়েছে। যথা—
বিষয়ক সংস্থা "বিএমজি"।
২. তাসমান সাগর অঞ্চলে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন আবহাওয়া পরিষেবা।
৩. সলোমন সাগরে পাপুয়া নিউ গিনি এবং পাপুয়া উপসাগরঅঞ্চলের পোর্ট মোরস্বি জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা।
৪. ব্রিসবেন ব্যুরো অফ মেটিওরোলজি, অস্ট্রেলিয়া প্রবাল সাগর অঞ্চলে।
৫. অস্ট্রেলিয়ার আরাফুরা সাগর এবং কার্পেনটেরিয়া উপসাগর অঞ্চলের ডারউইন ব্যুরো অফ মেটিওরোলজি।
৬. পার্থ ব্যুরো অফ মেটিওরোলজি, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভারত মহাসাগরে।

উত্তর ভারত মহাসাগর অঞ্চলে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ের নামকরণ শুরু হয়েছিল 2004 সালে, এবং প্রতিটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম WMO/ ESCAP প্যানেলের 13-সদস্যের দেশীয় কমিটি দ্বারা প্রস্তাবিত হয়। যথাক্রমে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, মালদ্বীপ, মায়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন নামের 13টি সদস্য দেশের দ্বারা প্রদত্ত বর্ণানুক্রমিক নামের সাহায্যেই ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করা হয়।

তবে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা সংশোধন করা হয়েছে এবং সেই তালিকায় সদস্য দেশগুলির প্রস্তাবিত প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের যথাক্রমিক তেরোটি নাম নিয়ে তেরটি কলাম বা স্তম্ভ রয়েছে। প্যানেলের সদস্যদের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সারি অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ঝড়ের নাম ক্রমানুসারে স্তম্ভ বরাবর ব্যবহার করা হবে। প্রথম নামটি প্রথম স্তম্ভের প্রথম সারি থেকে শুরু হবে এবং স্তম্ভ তেরোর শেষ সারি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলবে। টেবিল শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা হবে।

ওই জটিল তালিকাসূচি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এই ভেবে, সাধারণ মানুষ যাতে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম সহজে বুঝতে পারে তার জন্য এখানে সরলীকৃত ভাবে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় গুলির নামের একটি তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। নামকরণের জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের নাম বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে—

১. রেমাল (ওমান)
২. আসনা (পাকিস্তান)
৩. দানা (কাতার)
৪. ফেনগাল/ফেইঞ্জাল (সৌদি আরব)
৫. শাখতি (শ্রীলঙ্কা)
৬. মান্থা (থাইল্যান্ড)
৭. সেনিয়ার (ইউএই)
৮. দিতওয়া (ইয়েমেন)
৯. অর্ণব (বাংলাদেশ)
১০. মুরাসু (ভারত)
১১. আকভান (ইরান)
১২. কানি (মালদ্বীপ)
১৩. নাগামান (মিয়ানমার)
১৪. পাল ওমান)
১৫. সাহাব (পাকিস্তান)
১৬. লুলু (কাতার)
১৭. গাজির (সৌদি আরব)
১৮. গিগুম (শ্রীলঙ্কা)
১৯. থিয়ানয়োট (থাইল্যান্ড)
২০. আফুর (ইউএই)
২১. দিকসাম (ইয়েমেন)
২২. উপকুল (বাংলাদেশ)
২৩. আগ (ভারত)
২৪. সেপান্ড (ইরান)
২৫. ওডি (মালদ্বীপ)
২৬. কিয়ারথিত/ক্যাথি (মিয়ানমার)
২৭. নাসিম (ওমান)
২৮. আফশান (পাকিস্তান)
২৯. মৌজ (কাতার)
৩০. আসিফ (সৌদি আরব)
৩১. গগানা (শ্রীলঙ্কা)
৩২. বুলান (থাইল্যান্ড)
৩৩. নাহহাম (ইউএই)
৩৪. সিরা (ইয়েমেন)
৩৫. বারশোন (বাংলাদেশ)
৩৬. ব্যোম (ভারত)
৩৭. বুরান (ইরান)
৩৮. কেনউ (মালদ্বীপ)
৩৯. সাপাকি (মিয়ানমার)
৪০. মুজন (ওমান)
৪১. মানাহিল (পাকিস্তান)
৪২. সুহেল (কাতার)
৪৩. সিদরাহ (সৌদি আরব)
৪৪. ভেরাম্বা (শ্রীলঙ্কা)
৪৫. ফুটালা (থাইল্যান্ড)
৪৬. কুফাল (ইউএই)

৪৭. বাখুর (ইয়েমেন)
৪৮. রাজানি (বাংলাদেশ)
৪৯. ঝাড় (ভারত)
৫০. অনাহিতা (ইরান)
৫১. এন্দেরি (মালদ্বীপ)
৫২. ওয়েটউন (মিয়ানমার)
৫৩. সাদেম (ওমান)
৫৪. সুজানা (পাকিস্তান)
৫৫. সাদাফ (কাতার)
৫৬. হারেদ (সৌদি আরব)
৫৭. গর্জানা (শ্রীলঙ্কা)
৫৮. আইয়ারা (থাইল্যান্ড)
৫৯. দামান (ইউএই)
৬০. ঘুইজি (ইয়েমেন)
৬১. নিশীথ (বাংলাদেশ)
৬২. প্রবাহো (ভারত)
৬৩. আজার (ইরান)
৬৪. রিয়াউ (মালদ্বীপ)
৬৫. মাওয়ারহাউট (মিয়ানমার)
৬৬. দিমা (ওমান)
৬৭. পারওয়াজ (পাকিস্তান)
৬৮. রীম (কাতার)
৬৯. ফাইদ (সৌদি আরব)
৭০. নীবা (শ্রীলঙ্কা)
৭১. সামিং (থাইল্যান্ড)
৭২. দেম (ইউএই)
৭৩. হাওফ (ইয়েমেন)
৭৪. উর্মি (বাংলাদেশ)
৭৫. নীর (ভারত)
৭৬. পুয়ান (ইরান)
৭৭. গুরুভা (মালদ্বীপ)
৭৮. কিওয়ে (মিয়ানমার)
৭৯. মানজুর (ওমান)
৮০. জান্নাতা (পাকিস্তান)
৮১. রায়হান (কাতার)
৮২. কাসির (সৌদি আরব)
৮৩. নিন্নাদা (শ্রীলঙ্কা)
৮৪. কাইসন (থাইল্যান্ড)
৮৫. গগুর (ইউএই)
৮৬. বালহাফ (ইয়েমেন)
৮৭. মেঘলা (বাংলাদেশ)
৮৮. প্রভঞ্জন (ভারত)
৮৯. আরশাম (ইরান)
৯০. কুরাঙ্গি (মালদ্বীপ)
৯১. পিঙ্কু (মিয়ানমার)
৯২. রুকাম (ওমান)
৯৩. সারসার (পাকিস্তান)
৯৪. আনবার (কাতার)
৯৫. নাখিল (সৌদি আরব)
৯৬. ভিদুলি (শ্রীলঙ্কা)
৯৭. ম্যাচা (থাইল্যান্ড)
৯৮. খুব (ইউএই)
৯৯. ব্রম (ইয়েমেন)
১০০. সামিরন (বাংলাদেশ)
১০১. ঘুরনি (ভারত)
১০২. হেঙ্গামে (ইরান)
১০৩. কুরেধি (মালদ্বীপ)
১০৪. ইঙ্কাউং (মিয়ানমার)
১০৫. ওয়াতাদ (ওমান)
১০৬. বাদবান (পাকিস্তান)
১০৭. অউদ (কাতার)
১০৮. হাবুব (সৌদি আরব)
১০৯. ওঘা (শ্রীলঙ্কা)
১১০. মাহিংসা (থাইল্যান্ড)
১১১. দেগল (ইউএই)
১১২. শুকরা (ইয়েমেন)
১১৩. প্রোটিকুল (বাংলাদেশ)
১১৪. আম্বুদ (ভারত)
১১৫. সাভাস (ইরান)
১১৬. হোরাঙ্গু (মালদ্বীপ)
১১৭. লিনিওনে (মায়ানমার)
১১৮. আল-জারজ (ওমান)
১১৯. সরাব (পাকিস্তান)
১২০. বাহার (কাতার)
১২১. বারেক (সৌদি আরব)
১২২. সালিথা (শ্রীলঙ্কা)
১২৩. ফ্রেওয়া (থাইল্যান্ড)
১২৪. আথমাদ (ইউএই)
১২৫. ফারতাক (ইয়েমেন)
১২৬. সরোবর (বাংলাদেশ)
১২৭. জলধি (ভারত)
১২৮. তাহামতান (ইরান)
১২৯. থুন্ডি (মালদ্বীপ)
১৩০. কাইকান (মিয়ানমার)
১৩১. রাহাব (ওমান)
১৩২. গুলনার (পাকিস্তান)
১৩৩. সেফ (কাতার)
১৩৪. আলরেম (সৌদি আরব)
১৩৫. রিভি (শ্রীলঙ্কা)
১৩৬. আসুরি (থাইল্যান্ড)
১৩৭. বুম (ইউএই)
১৩৮. দারশা (ইয়েমেন)
১৩৯. মহানিশা (বাংলাদেশ)
১৪০. ভেগা (ভারত)
১৪১. তুফান (ইরান)
১৪২. ফানা (মালদ্বীপ)
১৪৩. বাউতফাত (মিয়ানমার)
১৪৪. রাদ (ওমান)
১৪৫. ওয়াসেক (পাকিস্তান)
১৪৬. ফানার (কাতার)
১৪৭. ওয়াবিল (সৌদি আরব)
১৪৮. রুদু (শ্রীলঙ্কা)
১৪৯. থারা (থাইল্যান্ড)
১৫০. সাফার (ইউএই), এবং
১৫১. সামহা (ইয়েমেন)

আপাতত এই পর্যন্ত। আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের এই তালিকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওই সংশ্লিষ্ট কমিটি পুনরায় নামের তালিকা প্রকাশ করবেন। তাই এই গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আমাদের সকলকে উদ্বিগ্ন হওয়ার পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বন করে বিপর্যয়ের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।

লেখক ***শ্রী তুহিন সাজ্জাদ সেখ*** *লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: sk.sajjadtuhin14@gmail.com

বড় বাদুড়

অমর কুমার নায়ক

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একমাত্র বাদুড় এমন প্রাণী যারা উড়তে পারে। আমাদের দেশে পাওয়া যায় এমন বাদুড়দের মধ্যে আকারে সবথেকে বড় হল বড় বাদুড়। আমার বাড়ীর আশপাশের এলাকায় আমি কোনদিনও এদের উড়তে দেখিনি, এমনকি আশপাশের অঞ্চলেও এদের সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর পাইনি। সম্ভবত জনবহুল এই এলাকায় মনুষ্য চক্ষুর অন্তরালে কোন গোপন আস্তানা আছে এদের। সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় এদের নানান ছবি দেখে খুব ইচ্ছে ছিল এদের ছবি তোলার, তাই লক্ষ্য রাখছিলাম সেরকম খবরের প্রতি। একদিন সুমন জানালো ওদের গ্রামে অনেক বড় বাদুর আছে একটা গাছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি কখনও। তাই যখন অনিরুদ্ধর গ্রাম কদমায় গেলাম তখন ওদের উঠোনে বসে চা খেতে খেতে দেখলাম বিশাল বড় আকারের বাদুড়গুলো মাঝে মাঝেই উড়ে এসে মাথার উপর চক্কর কাটছে। ওকে জিজ্ঞেস করতেই জানালো ওদের বাড়ীর সামনেই ঝোপঝাড়ে ঘেরা একটা বড় গাছে অনেক বাদুর ঝুলে থাকে। বাদুরের ঝুলে থাকার কথা শুনেই লালমোহন বাবুর রক্তচোষা বাদুরের কথা মনে পড়ে গায়ে শিহরণ খেলে গেল। যাইহোক আমাদের গন্তব্য শিলাবতি নদী যাওয়ার পথেই গাছটা পড়ে শুনে বেশ আনন্দ হল আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই তাদের উপস্থিতি টের পেলাম। গাছের গোড়াতে ধীরে ধীরে যেতেই দেখলাম অনেক বাদুড় ঝুলে আছে ডালে ডালে। কয়েকটা ছবি তুলে এগিয়ে যেতেই হুড়মুড়িয়ে ডাল থেকে উড়ে আকাশে ইতিউতি চক্কর কাটতে লাগল। ফ্লাইং ফক্সের ফ্লাইং ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে গেলাম সহজেই। প্রচুর ছবি তুলে আমি যখন তৃপ্ত ততক্ষনে তারাও নিজের নিজের ডালে ঝুলে পড়েছে।

এদের ইংরাজি নাম INDIAN FLYING FOX বা INDIAN FRUIT BAT এবং বিজ্ঞান সম্মত নাম *Pteropus giganteus.* এদের মুখ খ্যাঁকশিয়ালের মতো ছুঁচালো এবং লম্বাটে রোমহীন ছুঁচালো কানের জন্য এদের নাম উড়ন্ত খ্যাঁকশিয়াল (ফ্লাইং ফক্স) হয়েছে। মাথা থেকে দেহের দৈর্ঘ্য 19 থেকে 30 সে.মি., সামনের পা বা বাহুর দৈর্ঘ্য 15–18 সে.মি. এবং এদের দুপ্রান্ত মেলা অবস্থায় ডানার মাপ প্রায় চার ফুটের মতো হয়। পেছনের পাগুলো লম্বাটে। এরা সারা সময় নিজেদের পরিচর্যা করে কাটায় এবং ডানার সাহায্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে পারে। পুরুষেরা স্ত্রীদের তুলনায় বড় আকারের হয়। মুখের সামনের অংশ কালো রঙের হয়। কান কালো। ডানার রঙও কালো হয়। মাথার রং লালচে বাদামি, ঘাড় ও কাঁধের রং হালকা বাদামি হলুদ প্রকৃতির। পেটের রং হলদে বাদামি। চোখ দুটো বেশ বড় আকারের এবং গোলাকার। এই প্রজাতির বাদুড়ের লেজ থাকেনা। এরা সাধারণত মানুষের বসবাস আছে এমন অঞ্চলের বড় গাছে আরাম করে থাকে। এদের বসবাসের অঞ্চলের কাছাকাছি শস্যক্ষেত, জলাশয় এবং ফল গাছের বাগান থেকে থাকে। এরা ফলমূল, ফুল, পাতা প্রভৃতি খেয়ে থাকে। ফলের রস ও শাঁস খেয়ে বীজ ফেলে দেয়। এরা খাওয়ার আগে জলাশয়ের উপর ঘুরতে থাকে এবং জলপান করে। খাবারের খোঁজে এরা অনেক

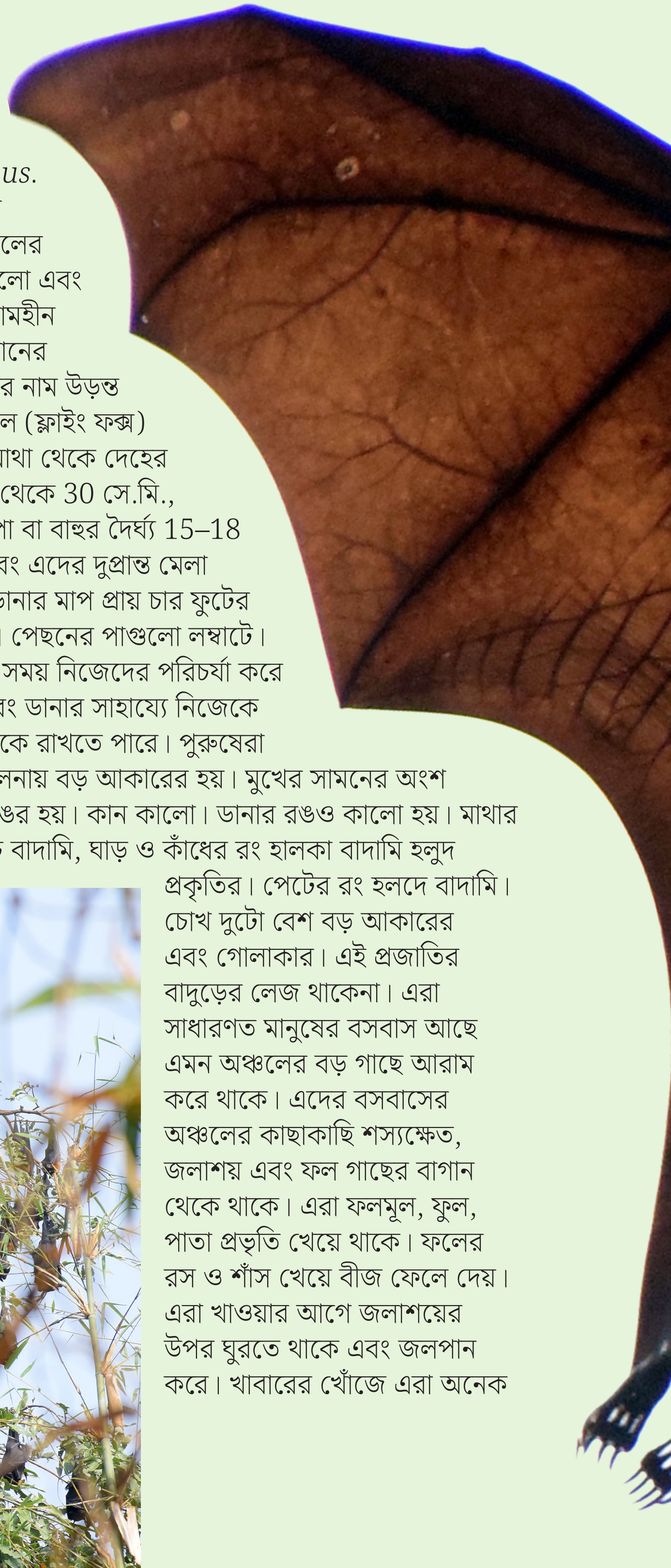

দূর অবধি উড়ে যায়। এরা খাবার খেতে খেতে অনেক দূর অবধি উড়ে যায় এবং সেখানে বীজ ফেলে। এইভাবে বীজ বয়ে নিয়ে গিয়ে এবং শরীরের নানা অংশে লেগে থাকা পরাগ রেণুর মাধ্যমে এরা বিভিন্ন ফসলের বংশ বিস্তার ঘটায়। এভাবে একদিকে উপকার করলেও ফলের বাগানে যথেষ্ট ক্ষতি করে ফলমূল খেয়ে এবং নষ্ট করে।

একসময় গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ বড় গাছ থাকায় এদের বেশ ভালো সংখ্যায় দেখা যেত। কিন্তু কয়েকটি সম্ভাব্য কারণের জন্য এখন এদের তেমন দেখা যায়না। প্রথমত বেশিরভাগ চাষি মনে করেন এরা ক্ষতিকর জীব এবং যেহেতু এরা ফলের প্রচুর ক্ষতি করে তাই ফলের বাগান বা ক্ষেতের আসেপাশে থাকলেই এদের উপর মারমুখী জনতা এদের তেড়ে আসে। এখন ফলের বাগানে এবং চাষের জমিতে তাই সরু জাল জড়িয়ে রাখার প্রথা চালু হয়েছে। এছাড়াও বড় গাছের আর তেমন দেখা মেলে না। তাই যারা পোড়ো বাড়ি এবং জঙ্গলে মানিয়ে নিতে পেরেছে আমরা তাদের দেখা পাই। ফলের চাষেও আজকাল বহুল ব্যবহার রয়েছে কীটনাশকের যা এদের শরীরে নানান কুপ্রভাব ঘটাচ্ছে। সর্বোপরি করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়াতে বাদুরের হাত আছে এমনটা অনেক মহলই মনে করেন তাই সেই সময় থেকে এখন অবধি কোথাও কোনও প্রাচীন গাছে বা অব্যবহৃত বাড়ীতে বাদুরের বাস থাকলে সেই গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে এবং বাড়ী থেকে বাদুর তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রজাতিটি আইইউসিএন লাল তালিকা অনুযায়ী বিপদমুক্ত শ্রেণিভুক্ত হলেও বিশ্বব্যাপী এদের সংখ্যা দ্রুত হারে কমছে যা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়।

*লেখক **শ্রী অমর কুমার নায়ক** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: *amarnayak.stat@gmail.com*

প্রকৃতিতে বন্ধুত্বের রকম-সকম

অরুণিমা ভৌমিক

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল বন্ধু চেনা! কে প্রকৃত বন্ধু আর কে যে স্বার্থান্বেষী, তাই নিয়ে মানব সমাজে দোলাচলের শেষ নেই। কিন্তু মুখোশধারী বন্ধুত্বের বিষয়টা শুধু যে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। প্রকৃতিতে সকল জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেও কোথাও শুধু প্রয়োজনের আবার কোথাও কেবল স্বার্থের। যাইহোক, তত্ত্বকথা ছেড়ে প্রকৃতিতে বন্ধুত্বের রকম-সকমে মনোনিবেশ করা যাক। আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছত্রাক ও সন্ধিপদীর বন্ধুত্ব। আলোচনা যত এগোবে, সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

কয়েক দশক আগেও ছত্রাকদের উদ্ভিদরাজ্যের অংশ হিসাবে ভাবা হোত। 1980 সালের পরবর্তী সময়ে ছত্রাকের কোশীয় উপাদান সমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি, পুষ্টির ধরণ, পরিবেশে কার্যকলাপ, জিনগত বৈশিষ্ট্য, বংশবিস্তার ইত্যাদি সব কিছুর তুল্যমূল্য বিচার করে বিজ্ঞানীরা ছত্রাককে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদরাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করতে নারাজ। বরং তাঁদের মত হল, ছত্রাকের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে প্রাণীজগতের; বিশেষ করে আর্থ্রোপোডা বা সন্ধীপদী প্রাণীদের। তাছাড়া, কেবলমাত্র জিনগত দিক দিয়েই নয়, মিল রয়েছে অনেক কিছুতেই। কাইটিন নামক অ্যামাইনোপলিস্যাকারাইড একদিকে যেমন আর্থ্রোপোডার বহিঃকঙ্কালের উপাদান, অন্যদিকে আবার ছত্রাকের কোশপ্রাচীরের ভিত্তি উপাদান সেই একই কাইটিন। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি প্রকৃতিতে বড় বড় গাছের সঙ্গে ছত্রাকের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে মাইকোরাইজার দ্বারা। আবার কালের নিয়মে, পৃথিবীর বুকে অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে সমান্তরাল বিবর্তনের পথ একসঙ্গে পাড়ি দিয়ে ছত্রাক ও আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের একে অপরের পরিপুরক হয়ে উঠতে দেখা যায়।

জঙ্গলে ঘেরা ছোটোনাগপুর মালভূমি জুড়ে স্থানে স্থানে দেখা মেলে উই ঢিবির, যা স্থানীয় ভাষায় 'মাকা' নামে পরিচিত। উই ঢিবি মূলত পুরোনো পচে যাওয়া গাছের কাঠ, পাতা, এবং মাটি দিয়ে তৈরী হয়। বর্ষার মরশুমে জঙ্গলের ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ। ঢিবির উপরকার সরু বালিযুক্ত মাটিতে আগে থাকতেই ছত্রাকের অসংখ্য রেণু মজুত থাকে। উই ঢিবির মাটি হালকা বৃষ্টির জলে একবার ভিজে গেলে ছত্রাকের রেণুগুলি অংকুরিত হয়ে হাজার হাজার সাদা রঙের ছোট ছোট ছত্রাকের সৃষ্টি হয়। এই ছত্রাক গুলি উই ছাতু বা মাকা ছাতু (*Termitomyces microcarpus*) নামে পরিচিত। এই ছাতুর উপরের অংশ ছোট গোল ছাতার (Pileus) মত মেলা যা সরু একটি দণ্ডের (Stipe) সঙ্গে সংযুক্ত। ছাতার উপরিভাগ মসৃণ এবং নীচের দিকটি মাছের ফুলকার মত খাঁজকাটা হয়।

চিত্র ১: উই ছাতুর ছবি সংবলিত একটি ডাকটিকিট।

চিত্র ২: উই ছাতু বা মাকা ছাতু (*Termitomyces microcarpus*) সচরাচর উই ঢিবির উপরে জন্মায়।

এইবার উইপোকার (*Trinervitermes biformis*) সঙ্গে মাকা ছাতুর বন্ধুত্বের গোপন রসায়নের কথায় আসি। উই ঢিবি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত শুকনো পাতা ও কাঠে উপস্থিত পেক্টো-সেলুলোজ উইপোকার হজমের অনুপযোগী। তাই বিশেষত বর্ষাকালে যখন ছত্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে, তখন উই ঢিবির আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা গাছের ডাল বা পাতা মধ্যস্থ সেলুলোজ ভেঙে মাকা ছাতু অপেক্ষাকৃত সরল উপাদান তৈরী করে। এরপর সেই সরলীকৃত শর্করা ও প্রোটিন সমৃদ্ধ অসংখ্য রেণু ছড়িয়ে দেয় উইয়ের বাসায়। উই পোকা সহজেই রেণুগুলি হজম করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং অপাচ্য অংশ মল রূপে বাইরে বের করে দেয়। আবার অনুকূল পরিবেশে সেই অপাচ্য অংশের সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে ছত্রাক বেড়ে ওঠে এবং এভাবেই পরস্পরের সহায়তায় দুজনেই টিকে থাকে অস্তিত্বের সংগ্রামে।

টিকে থাকার লড়াইয়ে এবার একটু অন্যরকম বন্ধুত্বের গল্পে আসা যাক। বন্ধুত্ব বলছি ঠিকই, তবে সম্পর্কটি বিতর্কিত। জীববিজ্ঞানীরা কেও কেও মনে করেন, এদের সম্পর্কটি পারস্পরিকতাবাদকে সমর্থন করে। আবার কারও মতে সম্পর্কটি ক্ষতিকারক। সত্যি বলতে, এই বন্ধুত্ব কিন্তু প্রাননাশী। এক্ষেত্রে সম্পর্কটি ব্যাট মথের (*Hepialus armonicanus*) লার্ভা ও 'কীড়া-জড়ি' বা 'ইয়ার-সা-গুম্বা' (*Ophiocordyceps sinensis*) নামের একটি প্রজাতির ছত্রাকের মধ্যে গড়ে ওঠে। 'কীড়া' অর্থে 'কীট' এবং 'জড়ি' অর্থে 'ওষুধ' বা দাওয়াইকে বোঝায়। অনেকে আবার মনে করেন, জড়ি বলতে 'বন্ধ' বা বন্ধনকে বোঝায়। তবে বলাই বাহুল্য সেই বন্ধুত্ব মোটেও সুখকর নয়। হিমালয়ের প্রায় 3500–5000 মিটার উচ্চতায় পূর্ব থেকে পশ্চিম হিমালয়ের স্থানে স্থানে মে থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত এই ছত্রাকের আবির্ভাব ঘটে। ভারতের বাইরে নেপাল, ভুটান, তিব্বত ও চীনের কিছু অংশে এই ছত্রাকটিকে জন্মাতে দেখা যায়। হিমালয়ের ওই উচ্চতায় আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এতটাই যে, পরিস্থিতি সতত পরিবর্তনশীল। প্রতিকূল পরিবেশে কীড়া-জড়ি ছত্রাকের রেণু খেতে আসে ব্যাট মথের লার্ভা। কারণ এই রেনু প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, গ্লাইসিন এবং অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের উৎস, যা ব্যাট মথের লার্ভার রূপান্তরে বেশ সাহায্য করে থাকে। আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি। রেণু খাওয়ার লোভে আসা ব্যাট মথের লার্ভার মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে

হিমালয়ের প্রায় 3500–5000 মিটার উচ্চতায় পূর্ব থেকে পশ্চিম হিমালয়ের স্থানে স্থানে মে থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত এই ছত্রাকের আবির্ভাব ঘটে।

চিত্র ৩: কীড়া-জড়ি (*Ophiocordyceps sinensis*) হিমালয়ের দুর্গম স্থানে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।

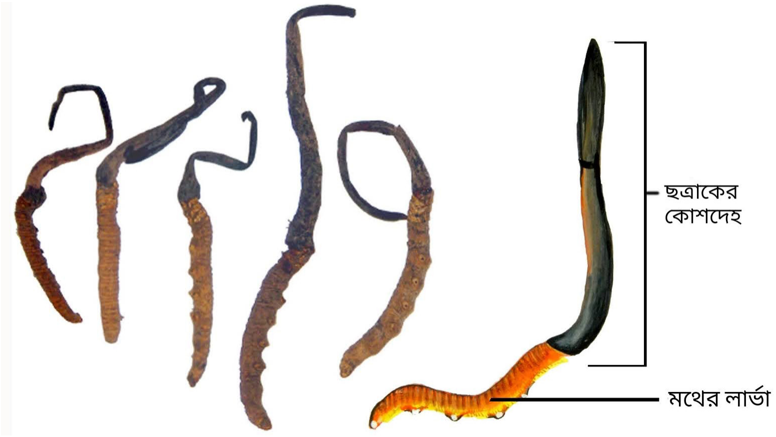

চিত্র ৪: কীড়া-জড়ির বাদামী বা কমলা রঙের অংশটি ব্যাট মথের মৃত লার্ভার দেহাবশেষ এবং কালো অংশটি ছত্রাকটির কোশদেহ।

জায়গা করে নেয় কিছু রেণু। এরপর রেণুগুলি অংকুরিত হয়। অসংখ্য মাইসেলিয়া লার্ভার দেহে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে লার্ভাটিকে নিস্তেজ করে ছত্রাকটি নিজে লার্ভার দেহরসে সিক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রায় 180 দিন সময় লাগে। এইভাবে আবার ইয়ার-সা-গুম্বা ছত্রাকের রেণুস্থলী থেকে নির্গত রেণু রক্তবীজের মত বিস্তার লাভ করে অন্য কোন লার্ভার শরীরে।

সত্যিকারের বন্ধুত্ব বা ছল কপটতার সাহায্যে পাতানো বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গিয়ে কে কতটা লাভবান হয় বা ক্ষতিস্বীকার করে জানি না। তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে, মানুষের প্রচুর লাভ হয়। উই ছাতু মাত্রেই খাদ্যোপযোগী। তাদের গঠন, গন্ধ, পুষ্টিমূল্য এবং অন্যান্য উপকারী বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ছত্রাকটির চাহিদা আকাশছোঁয়া। উপরন্তু, সাম্প্রতিক গবেষণায় ইঙ্গিত মিলেছে যে মাকা ছাতু মধ্যস্থ জৈব-সক্রিয় যৌগগুলি কিছু নির্দিষ্ট মানব রোগ, যেমন ক্যান্সার, হাইপারলিপিডেমিয়া, গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল রোগ এবং আলঝাইমারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে, কীড়া-জড়ির বিভিন্ন লোকায়ত ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রথম প্রবন্ধটি লেখা হয় 1757 সালে তিব্বতে। বিভিন্ন ধরণের মানব রোগ যেমন বৃক্ক, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সমস্যায়; ক্লান্তি, হেঁচকি এবং দেহে গুরুতর আঘাতের কারণে সৃষ্ট ব্যাথা উপশমের পাশাপাশি পুরুষ এবং মহিলাদের যৌন অক্ষমতা কাটিয়ে তুলতে কীড়া-জড়ির জুড়ি মেলা ভার। কীড়া-জড়িকে 'হিমালয়ের ভায়াগ্রা' বলা হয়। এই একটি মাত্র কারণে এই ছত্রাকটির বাজারদর কয়েক লক্ষ টাকা। হয়ত সেইজন্যই একে হিমালয়ের সোনা বলা হয়ে থাকে। এমনকি, ক্যান্সারের মত প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসায় কীড়া-জড়ির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এর কতটা অন্ধবিশ্বাস আর কতটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, তা অবশ্য হলফ করে বলা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর আনাচে কানাচে গড়ে ওঠা এই ধরণের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে মনে হয়, বন্ধুত্ব নিঃস্বার্থের হোক বা স্বার্থের, অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। এটাই বোধহয় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির সৌখিনতা ও নৈপুনতা।

কীড়া-জড়িকে 'হিমালয়ের ভায়াগ্রা' বলা হয়। এই একটি মাত্র কারণে এই ছত্রাকটির বাজারদর কয়েক লক্ষ টাকা।

*লেখিকা **কুমারী অরুণিমা ভৌমিক** একজন বিজ্ঞান লেখিকা ও লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: arunimabhaumik10@gmail.com.*

যারা আলো জ্বেলেছিল (পর্ব – ১১)

অরুণাভ দত্ত

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অগ্রগতি সমানুপাতিক। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ততই বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতার স্বরূপ। শুরুটা হয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াই দিয়ে। সে লড়াই আজও থামেনি। চলছে পৃথিবীর অবর্তমানে অন্য গ্রহে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ থেকে অ্যাপোলো 11, দ্রুততার সঙ্গে মানুষ পৌঁছেছে উন্নতির শিখরে এবং বিজ্ঞানের এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁদের জন্যই যাঁরা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে প্রথম বিজ্ঞানের আলো জ্বেলেছিল।

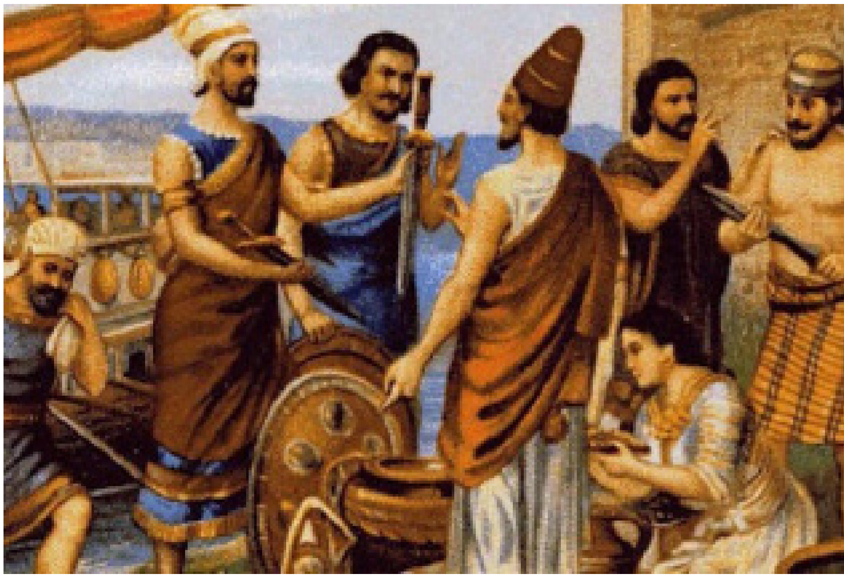

এবার আমরা আলো ফেলব বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রায় অনালোকিত এক অধ্যায়ের উপর।

চলুন বসে পড়ি আমাদের সেই কল্পনার বাহনে, আমাদের সেই টাইম মেশিনে। আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি অনেক যুগ আগে। যাচ্ছি ... যাচ্ছি ... এবার পৌঁছলাম। আবার আমরা এসে পড়েছি যিশু খ্রিস্টের আবির্ভাবের আগে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরুর দিকের কথা। সেই সময় কৃষি, পশুপালন ও হস্তশিল্পের প্রচুর উন্নতি ঘটেছে। বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ফলস্বরূপ সেই সময় ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে দ্রুত বহু সমৃদ্ধশালী শহর গড়ে উঠেছিল। সেই সব শহরে বাস করত ফিনিশীয় (Phoenician) নামক একটি জাতি। আজকের ইসরায়েল, লেবানন ও সিরিয়া অঞ্চলে সেই সমস্ত ফিনিশীয়দের বসবাস ছিল। ফিনিশীয় শহরগুলির মধ্যে সমৃদ্ধতম ছিল সমুদ্রোপকূলের অদূরবর্তী একটি দ্বীপে অবস্থিত ‘তির’ নগরী।

খ্রিস্টপূর্ব 1100 অব্দের আগে ফিনিশীয়রা মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে দক্ষ নাবিক ও জাহাজনির্মাতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। জানা যায়, ফিনিশীয়দের দেশটা মোটেই সুজলা, সুফলা ছিল না। সেই অনুর্বর দেশে শস্য, আনাজপাতি, ফলমূল বড় একটা উৎপাদিত হত না। সেই কারণে পাহাড় থেকে সিডার গাছ কেটে এনে তা দিয়ে বানানো হত জাহাজ। তার পর সেই জাহাজ ভূমধ্যসাগরে ভাসিয়ে তারা পূর্ব ইউরোপে বাণিজ্য করতে যেত। শুধু সাগরেই তারা আবদ্ধ ছিল না, তারা আটলান্টিক মহাসাগরেও অভিযান চালিয়েছিল। জানা যায়, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকান অঞ্চলেও তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ বন্দর ছিল তাদের পশ্চিমের বাণিজ্যকেন্দ্র।

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী প্রায় সমস্ত স্থানেই ফিনিশীয় সওদাগরেরা তাদের সওদা নিয়ে বাণিজ্য করতে যেত। মধ্যপ্রাচ্যের জিনিসপত্রের বিনিময়ে তারা কিনত স্থানীয় জিনিসপত্র। তাদের বাণিজ্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল ক্রীতদাস কেনা-বেচা। ফিনিশীয়রা যেমন নির্ভীক অভিযাত্রী ছিল, যেমন দক্ষ নাবিক ছিল, তেমনই চঞ্চল সমুদ্রের মতোই তারা ছিল অশান্ত। স্বভাবে ছিল নিষ্ঠুর। জানা যায়, ফিনিশীয়রা ক্রীতদাস কিনত। আবার অন্যান্য জাহাজগুলোয় হানা দিয়ে লোকজন ধরে এনে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করত। ফিনিশীয়দের নৌ-বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরীয় বহু দেশে দাসমালিকদের সমাজ গড়ে তুলতে ইন্ধন জুগিয়েছিল এবং সেখানে মধ্যপ্রাচ্য সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ধাতু শিল্পে ও রাসায়নিক শিল্পে তারা খুবই উন্নত ছিল। ইতিহাসে ফিনিশীয়দের আরও এক উল্লেখযোগ্য অবদান হল

লিপির বিকাশ। মেসোপটেমিয়ায় লিপির আবির্ভাব হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে। তখন লেখালেখি করা ছিল বেশ শক্ত কাজ। সেখানে প্যাপিরাস না থাকায় লিখতে হত মৃত্তিকাফলকে। যিনি লিখবেন তার পাশে রাখা থাকত এক তাল এঁটেল মাটি। সেই মাটির তাল থেকে ছোট ছোট স্লেট বা মৃত্তিকাফলক বানানো হত। মাটি কেটে কেটে লেখা এই মৃত্তিকাফলক যাতে শক্ত ও টেকসই হয়, সে জন্য রোদে ফেলে রেখে তা ভাল ভাবে শুকিয়ে নেওয়া হত, নয়তো আগুনে পোড়ানো হত।

মেসোপটেমিয়ায় প্রথম দিকে লিখতে হত ছবি এঁকে এঁকে। ছুঁচলো কাঠি দিয়ে মাটি কেটে তার উপরে অক্ষর দেগে দেওয়া হত বলে সেই অক্ষরগুলো দেখতে হত গোঁজ বা কীলকের মতো। তাই এই ধরনের লিপিকে বলা হয় কীলকলিপি বা কিউনিফর্ম (cuneiform)। লেখার কাজে প্রায় হাজার রকমের সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহৃত হত। প্রতিটি অক্ষর কয়েকটি কীলকাকার সঙ্কেত চিহ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠত। সেই অক্ষরে কখনও বোঝা যেত সম্পূর্ণ একটি শব্দ, আবার কখনও শুধুমাত্র শব্দাংশ। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া এই কিউনিফর্মের জন্মভূমি হলেও তা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এদিকে বাণিজ্যিক লেনদেনের সময় হিসেবনিকেশের জন্য দ্রুত লিখনপদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিল। কীলকলিপির সাহায্যে লেখালেখি করতে গিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। ফিনিশীয়রা তখন কাজে লাগাল মিশরীয়দের অভিজ্ঞতাকে। মিশরীয়দের ছিল চিত্রলিপি চিহ্ন। তাতে শুধু শব্দই বোঝাত না, আলাদা আলাদা ধ্বনি পর্যন্ত বোঝাত। ফিনিশীয়রা বর্ণমালা আবিষ্কার করল—22টি ব্যঞ্জনবর্ণ। লেখার সময় তারা স্বরধ্বনি বোঝানোর জন্য কোনও চিহ্ন ব্যবহার করত না। বর্ণমালা তৈরি করার ফলে দ্রুত লেখালেখি সম্ভব হল। শোনা যায়, সেই বর্ণমালাই গ্রিক ও রোমান বর্ণমালার ভিত্তি।

এবার আসা যাক ফিনিশীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদানটির প্রসঙ্গে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকে সমুদ্রপথে জলযানের সাহায্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিরন্তর ছুটে চলেছে, তার পিছনে ফিনিশীয়দের বড়সড় অবদান রয়েছে। নৌবিজ্ঞানে তাদের উন্নতির কথা শুনলে অবাক হতে হয়। ফিনিশীয়রা সমুদ্র অভিযানের জন্য যে সব জাহাজ তৈরি করত, সেগুলোর এক একটির দৈর্ঘ্য ছিল আশি থেকে একশো ফুট পর্যন্ত। তাদের জাহাজের সামনে লাগানো থাকত একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র। ওই যন্ত্রের সাহায্যে ওরা কোনও নৌকা কিংবা জাহাজকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলত। জানা গিয়েছে, আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় পদ্ধতি ফিনিশীয়দের আবিষ্কার।

জাহাজের কথাই যখন উঠল, তখন একবার ঘুরে আসতেই হবে প্রাচীন ভারতবর্ষে। তবে প্রাচীন ভারত তথা বাংলার এই গৌরবময় ইতিহাস অন্ধকার থেকে আলোয় আনার কৃতিত্ব গত শতাব্দীর অন্যতম প্রাচ্যবিদ এবং একনিষ্ঠ গবেষক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। তিনি চর্যাপদ আবিষ্কার করে বাঙালির কাছে তুলে ধরেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। তাঁর এই আবিষ্কারও এক অনন্যসাধারণ আলো জ্বলার কাহিনী। আপাতত আমরা চোখ রাখব প্রাচীন যুগের জাহাজনির্মাণশিল্পের প্রসঙ্গে।

বঙ্গভূমি জুড়ে শিরা-উপশিরার ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী, উপনদী, শাখানদী, খাঁড়ি। সুতরাং প্রাচীন বাংলার বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য জলযান নির্মাণ করতেই হবে তাতে সন্দেহ নেই। সেকালে নৌকারও অনেক রকমফের ছিল। দোণা, দুণি, ডিঙি, ভেলা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। আর ছিল বড় বড় জাহাজ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা থেকে জানা যায়, শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক বঙ্গদেশে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর নাম সিংহবাহু। রাজা সিংহবাহুর বড় ছেলের নাম বিজয়। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড দামাল। প্রজারা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাজার কাছে নালিশ জানাল, ‘রাজামশাই, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। এ ছেলেকে দিয়ে কারও কোনও উপকার হবে না। অতএব ছেলেটিকে বিদেয় করুন।’

জনদরদী রাজা প্রজাদের আদেশ শিরোধার্য করে বিজয়কে একটি নৌকায় চাপিয়ে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিলেন। জানা যায়, মোট তিনটি নৌকা সমুদ্রযাত্রা করেছিল। প্রথম নৌকায় বিজয়, দ্বিতীয় নৌকায় বিজয়ের অনুচরবর্গের ছেলেরা এবং তৃতীয় নৌকায় তাদের স্ত্রীরা ছিল। বিজয় তাঁর দলবল নিয়ে প্রথমে বোম্বাইয়ের কাছে সুপ্পারাক নগরে এবং পরে লঙ্কাদ্বীপ অর্থাৎ আজকের শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি, বিজয় যেদিন

শ্রীলঙ্কায় পা রাখলেন, সেদিন ভারতের কুশীনগরে বুদ্ধদেব দুটি শাল গাছের মাঝে শুয়ে নির্বাণ লাভ করছিলেন। সেদিন তিনি ইন্দ্রকে ডেকে বলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামল। সে সেখানে আমার ধর্মপ্রচার করবে, তুমি তাকে রক্ষা করো।"

জানা গিয়েছে, সেই তিনটি নৌকাই আকারে খুব বড় ছিল এবং সব মিলিয়ে প্রায় সাতশো জন যাত্রী ছিল। ইতিহাসে বিজয়ের জলযানকে নৌকা বলা হলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'সাতশো লোক যে নৌকায় যায় সে তো জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে ওইরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত।' বিজয় যে জাহাজে চড়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন, সেই জাহাজের ছবি আঁকা আছে অজন্তার গুহায়। ছবিতে দেখা যায় সেই জাহাজে মাস্তুল, পাল ইত্যাদি ছিল।

আজ যেখানে মুম্বাই, প্রাচীনকালে সেই মুম্বাইয়ের কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়োচ নামে একটি বড় বন্দর ছিল। সেখান থেকে ব্যাবিলন যাওয়ার বড় বড় জাহাজ ছাড়ত। প্রাচীন ভারতের আরও একটি বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত (অধুনা তমলুক)। সেকালে তাম্রলিপ্ত ছিল গঙ্গার তীরে (মতান্তরে গঙ্গার শাখা সরস্বতী নদীর তীরে) অবস্থিত। যদিও বহু বছর পরে তমলুক ভূপরিবর্তনের ফলে ভিতরের দিকে সরে গিয়েছে। খ্রিস্ট জন্মের চারশো বছর পরে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে স্বদেশের দিকে যাত্রা করেছিলেন। ফা-হিয়েন, ই-ৎসিং প্রভৃতির সময় এবং 'দশকুমারচরিত' রচয়িতা দণ্ডিনের সময় শ্রীলঙ্কা, জাভা প্রভৃতি দেশে যাতায়াতের জন্য তাম্রলিপ্ত বন্দরকেই ব্যবহার করা হত।

সাতশো লোক যে নৌকায় যায় সে তো জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে ওইরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত।

কালিদাস লিখে গিয়েছেন, বাংলার রাজারা নৌকায় চড়ে যুদ্ধ করতেন। আবার বাংলার জাহাজনির্মাণশিল্পের সুবর্ণযুগের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের পাতায়। জানা গিয়েছে, সেকালের বণিকরা পনেরো-ষোলোটা জাহাজ নিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন। গঙ্গার মাঝিরা জাহাজগুলোকে পথ দেখিয়ে সমুদ্র অবধি পৌঁছে দিত। বণিকরা সিংহল অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা সহ সমুদ্রের আরও অনেক দ্বীপ, উপদ্বীপেও বাণিজ্য করতে যেতেন।

প্রাচীন বাংলার বিজনেস আইকন চাঁদ সদাগরের প্রধান জাহাজের নাম ছিল মধুকর। কোনও কোনও পুথিতে লেখা আছে যে, মধুকর জাহাজের বারোশোটা দাঁড় ছিল। এই মধুকর সংক্রান্ত একটি ঘটনার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা কল্পবিজ্ঞান 'পলাতক তুফান'-এর এক আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়। 'পলাতক তুফান' গল্পের বিষয়বস্তু মোটামুটি এই রকম—

কোনও এক বছরের 29 তারিখ খবরের কাগজে ছাপা হয়, আলিপুর আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর এক ভয়াবহ তুফান ঘনীভূত হয়েছে। এর ফলে 1 অক্টোবর কলকাতায় প্রচণ্ড ঝড় হবে। এমন ভয়াবহ ঝড় কলকাতায় নাকি বহু বছর হয়নি। এদিকে ঝড়ের আশঙ্কায় শহরবাসী সন্ত্রস্ত। আগের দিন রাত্রে কারও চোখে ঘুম নেই। সকলের মনে 'আগামীকাল কী হয় কী হয়' ভাব। কিন্তু ১ অক্টোবর কলকাতায় কোনও ঝড় হল না। সকাল থেকে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হওয়ার পর বিকেলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। এমনকী ঝড়ের অভিমুখ কোনদিকে ঘুরে গিয়েছে, ঝড় কোথায় অবস্থান করছে, সে সব কিছুই জানা গেল না। ঝড় বেপাত্তা! মানুষ হতভম্ব। খবরের কাগজগুলো বলতে লাগল, হাওয়া অফিসের ভুল পূর্বাভাসের ফলে জনে জনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিজ্ঞান মিথ্যা হয়ে গেছে। এমন অকর্মণ্য হাওয়া অফিস তুলে দেওয়া হোক। গল্পের শেষে লেখক জানাচ্ছেন তুফানের হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার রহস্য।

হয়েছিল কী, সেই বছর ঝড় ওঠার আগে লেখক সদ্য রোগমুক্ত হয়ে ডাক্তারের পরামর্শে জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করেন। যাবেন শ্রীলঙ্কা। লেখক 28 সেপ্টেম্বর জাহাজে উঠেছিলেন আর 1 অক্টোবর মাঝসমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। অশান্ত সমুদ্র ফুঁসছে। বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ প্রায় ডুবু-ডুবু। যাত্রীরা মরণভয়ে চিৎকার করছে। এমন সময় লেখকের মনে পড়ল যে, তাঁর ব্যাগে মাথার চুল গজানোর মহৌষধ এক শিশি 'কুন্তল কেশরী' তৈল আছে। তিনি কাগজে পড়েছিলেন, তেল চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে। লেখক তখন জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শিশির ছিপি খুলে সমস্ত 'কুন্তল কেশরী' তেল সমুদ্রে ঢেলে দিলেন। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্র শান্ত হল, তুফান পালিয়ে গেল। এক শিশি চুল গজানোর তেল সেদিন কলকাতার প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করেছিল।

আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রাচীন বাংলার কবি দ্বিজ বংশীদাসের মনসা ভাসানে আছে এ রকম একটি ঘটনার কথা। চাঁদ সদাগর সিংহল থেকে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছেন। তেরোদিন ধরে সমুদ্রে ভেসে থাকার পর হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। জাহাজ প্রায় ডুবতে বসেছে। চাঁদ সদাগর ভয় পেয়ে মধুকরের মাঝির শরণাপন্ন হলেন। জাহাজে অনেকগুলো তেলের পিপে রাখা ছিল। মাঝি কয়েকটি তেলের পিপা খুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। ঢেউ থেমে গেল। জাহাজগুলোও অক্ষত। চাঁদ সদাগর সঙ্কটমুক্ত হলেন। ●

*লেখক **শ্রী অরুণাভ দত্ত** জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানকর্মী। ইমেল: wrarunabha18@gmail.com*

সোয়ালো পাখি

তাপস কুমার দত্ত

আবাবিল

আমাদের পরিবেশে অনেক ধরনের সোয়ালো পাখি আছে। এদের ছবি তোলা খুবই দুষ্কর একটি কাজ। কারন হলো এরা খুব ছটফটে পাখি। এই পাখির সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিলো হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে দিল্লী রোডে। তারিখটা ছিলো খুব সম্ভবত 2013 সালের 2রা এপ্রিল, একটা বড়ো পুকুরে বাঁশের উপর অনেক সংখ্যক Barn Swallo পাখি স্থির হয়ে বসে ছিলো, এই ভাবেই প্রথমে এই পাখির সাথে আমার পরিচয়। এরপর আমার বাসভূমি হালিসহরে এই Burn swallow পাখির সাথে Streak Throated Swallow ও Assy Wood Swallow পাখির দেখা পেয়েছিলাম।

Barn Swallow পাখি আকারে খুব একটা বড় হয় না, লম্বায় লেজ নিয়ে সাধারনত 17–19 সেমি, তার মধ্যে 2–7 সেমি লেজের দৈর্ঘ্য, ডানার বিস্তৃতি প্রায় 32–34 সেমি এবং ওজনে এরা 16–22 গ্রাম হয়ে থাকে। মাথা উপরের থেকে পিঠ পর্য্যন্ত রঙ উজ্জ্বল Steel-Blue হয়ে থাকে, পরে লেজের দিকে এই রঙ অনেক হালকা হয়ে যায়, তাতে হালকা বাদামী আভা থাকে। মাথার সামান্য নীচ থেকে ঠোঁটের নীচ পর্য্যন্ত রঙ লালচে বাদামী রঙের হয়ে থাকে, বুকের দিকের অংশটি সাদা রঙের হয়ে থাকে। ঠোঁট আকারে ছোটো হয়। এদের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে খুব একটা ফাঁরাক লক্ষ্য করা যায় না মোটামুটি একই রকম দেখতে হয়। তবে যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে পুরুষ পাখির তুলনায় স্ত্রী পাখির লেজের দৈর্ঘ্য কম হয় ও এদের গায়ের রঙ কম উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Hirundo rustica* এবং এদেরকে বাংলাতে অনেকে আবার আবাবিল বলে থাকে।

এই পাখির বাসাটা অনেকটা মৌমাছি বাসার মতন হয় থাকে, পুরুষ ও স্ত্রী পাখি উভয়ে মিলে ঠোঁটে করে কাদা মাটি সংগ্রহ করে তাতে ঘাসের অংশ মিলিয়ে নিয়ে বাসা বানায়। বাসার ভিতর সুরঙ্গরের মতো থাকে। কোনো জলাশয় বা লোকালয় অংশে এরা বাসা বাধেঁ এবং এই বাসাতে এরা 3–7 টি ডিম পাড়ে, ডিমগুলো ক্রীম রঙের বা হালকা দুধে আলতা রঙের হয় এবং তাতে বাদামী রঙের ছিট ছিট দাগ থাকে। এই ডিম 12–17 দিনের মাথায় ফুটে বাচ্ছা Barn Swallow বা আবাবিলের জন্ম হয়। যেখানে পুকুর বা জলাশয় আছে, কাদা মাখা জমির কাছাকাছি কোনো তারের উপর ভাঙ্গা ডালপালার উপর এদেরকে বসতে দেখা যায়, নাহলে সারাক্ষন সারাদিন জলের উপর এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এরা ঘুরপাক দিতে থাকে, এদের উড়ার যেন কোনো বিরাম থাকে না। এরা যখন উড়তে থাকে তখন মুখে একটা সুন্দর আওয়াজ trr – trr করে উড়তে থাকে এবং এই শব্দটা অবিরাম করতে থাকে।

Streak Throated Swallow পাখি আকারে খুব একটা বড় হয় না, লম্বায় সাধারনত 11–12 সেমি এবং ওজনে এরা 8–10 গ্রাম হয়ে থাকে। এদের মাথার দিকের অংশের রঙ গাঢ় বাদামী রঙের, পিঠের দিকের অংশের রঙ উজ্জ্বল Steel–Blue

স্ট্রিক-থ্রোটেড সোয়ালো

ছাই উডসোয়ালো

রঙের হয়ে থাকে, বুকের দিকের অংশটি সাদা রঙের ও তাতে ঠোঁটের পরের থেকে বুকের অনেকটা অংশ পর্যন্ত ছোটো ছোটো বাদামী রঙের লম্বা ছিট ছিট দাগ থাকে, এই কারনই হয়তো এদেরকে Streak Throated Swallow পাখি বলে। লেজের অংশটি খুব বড় হয় না। ঠোঁট আকারে ছোটো হয়। এদের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে খুব একটা ফারাক লক্ষ্য করা যায় না মোটামুটি একই রকম দেখতে হয়।

এই Streak Throated Swallow পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Hirundo fluvicola* এবং এদের হিন্দি ভাষাতে লোকাল নাম হলো Nahar ababil এবং গুজরাঠীরা এদেরকে Bhekhad ababil বলে থাকে। এদেরকে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গা যেমন—পাকিস্তান, আমাদের জম্বু-কাশ্মীর, সিকিমে ইত্যাদি জায়গাতে এদেরকে দেখা যায়। সারা বছর সাধারনত ডিসেম্বর–এপ্রিল এবং জুলাই–অক্টোবর এরা এদের বাসা বাধেঁ। বাসাটা অনেকটা মৌমাছি বাসার মতন হয় থাকে এবং এই বাসা বানাতে মাটি ব্যবহার করে। বাসার ভিতর সুরঙ্গর মতো থাকে। এদের বাসার ধরন অনেকটাই Burn Swallow পাখির মতো হয়ে থাকে। কোনো জলাশয় বা লোকালয় অংশে এরা বাসা বাধেঁ এবং এই বাসাতে এরা 3–4 টি ডিম পাড়ে, ডিমগুলো সাদা রঙের হয় আবার কোনো কনো সময় কিছুটা বাদামী রঙের হয় থাকে।

উভয় পাখিই উড়ন্ত অবস্থাতে পোকামাকড়, প্রজাপতি ইত্যাদি শিকার করে এবং তা খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে। শীতকালের সকাল থেকে সূর্য অস্ত হওয়া পর্যন্ত এরা সারাক্ষন উড়তে থাকে, এদের উড়ার যেন কোনো সময়ের জন্য বিরাম থাকেনা। কখনও আবার এদেরকে কোনো তারে, দড়িঁ বা ডালে বসে থাকতে দেখা যায়।

Assy wood Swallow পাখির বাংলা নাম হলো তালচটক এবং বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Artamus fuscus*, এদের স্ত্রী ও পুরুষের ভেদাভেদ বোঝা খুবই মুশকিল। এদের মাথা, ডানা ও গলা নীলাভ ধূসর রঙের হয়ে থাকে। দেহের নীচের দিকের অংশ গোলাপী আভাযুক্ত ধূসর হয়ে থাকে। চোখ কালো এবং চোখ ও ঠোঁটের মাঝের অংশ কালো হয়ে থাকে। লেজের রঙ কিছুটা ধূসর হয়ে থাকে। এদের লেজ ছোটো আকারের এবং এই লেজের প্রান্ত ভাগ সাদা হয়ে থাকে। এরা এক সাথে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। এরা যখন কোনো ডালে বা তারে বসে তখন একসাথে ঠাসাঠাসি করে বসতে ভালোবাসে। খাদ্য হিসাবে এরা প্রজাপতি, ফরিং, উইঁপোকা ও ফুলের মধু খেয়ে থাকে। এদের ডাক খুব কর্কস ও কাঁদুনে সুরে অনেকক্ষন ডেকে চলে এবং তা অনেক দূর থেকেই শোনা যায়।

এই পাখিরা আমাদের পরিবেশে ভালোভাবে বিচরন করুক এটাই আমরা সবাই চাই। পরিবেশকে এদেরকে উপযুক্ত বাসভুমি করার জন্য সমাজের সমস্ত মানুষের এই বিষয়ে সচেতন হলে আমরা কখনই এদেরকে হারাবো না। এদেরকে নিয়ে আমাদের পরিবেশ আরো সুন্দর হয়ে উঠুক এটাই আমাদের সবার কাম্য।

*লেখক **শ্রী তাপস কুমার দত্ত** বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

ঘরে ঘরে রসায়ন

অসীম বসাক

পাগল নাকি! এভাবে অফিসটাইমে হাসফাশ-ট্রেনে বকবক! না না আমি কেমিস্ট্রি বলছি না, ... লোকটা বললেন, ... বইয়ে আছে কেমিস্ট্রির জন্ম হয়েছিল আরবে আর অ্যালকেমির আধুনিক নাম হচ্ছে কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রির জন্ম এই ভারতের মাটিতেও হয়েছে এটা একজন বাঙালি প্রমান করেছেন। তিনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। রস একটা সংস্কৃত শব্দ। অর্থ পারদ। পারদের বিজ্ঞানকে রসায়ন বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পারদের ব্যবহার ও গবেষণা করতেন। রসায়ন শব্দ থেকে কেমিস্ট্রি শব্দের জন্ম হয়েছে। লোকটা চিৎকার করে বলে চলেছেন, এজন্য আমাদের গর্ব হওয়া উচিৎ। ট্রেনে ভিড় বাড়ছে আর লোকটার বকবকানি বেড়েই যাচ্ছে। তিনি বললেন সবাই জানে এ ফর অ্যাপেল। আমি বলছি এ ফর অ্যান্টিঅক্সিডান্ট। এবারে অনেকেই লোকটার কথা শুনতে চেষ্টা করলো। লোকটা বলছেন, ঘরে ঘরে অ্যান্টিঅক্সিডান্ট লেবু, হলুদ, লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ,রসুন, কুমড়ো আরও অনেক কিছু। এগুলো আমাদের কোষ দেহকে চাঙ্গা ও তরুণ রাখে। চামড়া কুচকায় না। বেশ কচি কচি দেখতে লাগে। এরপর যা বললেন তা শুনে অনেকেই হেঁসে উঠলো; সাবান খেতে কেমন? হাত দিয়ে ধরলে কেমন লাগে? তিনি বললেন, সাবান তিতো আর পিচ্ছিল। সাবানে হলুদ লাল হয়ে যায়। কেন? কারন সাবানে ক্ষার বা ক্ষারক বা বেস থাকে। তার মানে ঘরে ঘরে সাবান আর সাবানে থাকে ক্ষার বা বেস। আপনারা জানেন বি ফর বল, ব্যাট ... আমি বলছি বি ফর বেস। ঘরে ঘরে বেস মানে ঘরে ঘরে রসায়ন। আমরা ভাত রুটি খাই। এগুলো কার্বোহাইড্রেট। তাহলে সি ফর চাল, গম, ভুট্টা—আমাদের খাবার কার্বোহাইড্রেট। আবার সি ফর সিগারেট মানে ক্যান্সার। এর ধোঁয়ায় সাত হাজার রাসায়নিক থাকে। সব রকমের তামাকজাত জিনিসই ক্যান্সারের কারন। একটা হিসাব দিচ্ছি; আপনি রোজ যদি দশ টাকার সিগারেট বা তামাক খান তাহলে গড়ে একমাসে লাগে তিনশো টাকা। বছরে ছত্রিশশো টাকা। যদি মাত্র দশ বছর সিগারেট খান তাহলে আপনি ছত্রিশ হাজার টাকা পুড়িয়ে ফেলেছেন আর পেয়েছেন ক্যান্সার, আপনার আশেপাশে অনেকে পেয়েছেন পরোক্ষ তামাক-দূষণ।

সাবধান! অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না। লোকটার আশেপাশে কয়েকজন বললেন কেন? উত্তর, সাধারন ডিটারজেন্টে নাইট্রেট ও ফসফেট থাকে। এগুলো জলে ধুয়ে জলাশয়ে মেশে। জলাশয়ের পুষ্টি হয়, আর জলজ গাছপালাগুলো বেশি বেশি বড় হয়। ওরা জল থেকে অক্সিজেন নেয় তাই জলজ প্রাণীরা যেমন মাছ অক্সিজেন পায় না। ওরা মারা পরে, জলাশয় শেওলায় ভরে যায়, পচা ডোবা হয়ে যায়। এককথায় জলাশয়ের অতিপুষ্টি বা ইউট্রোফিকেশনের জন্য শ্যাওলার বংশবৃদ্ধি বা অ্যালগাল ব্লুম হয়। জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়। তাহলে ঘরে ঘরে ডিটারজেন্ট। ডি ফর ডিটারজেন্ট। ঘরে ঘরে রসায়ন।

লোকটা চেঁচিয়ে বললেন, টুথ ব্রাশ থেকে বালতি-বোতল, টেবিল-চেয়ার, পেন-প্যাকেট, জুতো ... সবই প্লাস্টিকময়। পলিইথিলিন বা পলিথিন একরকমের প্লাস্টিক। এটা বানাতে ইথিলিন লাগে। তাহলে ঘরে ঘরে ইথিলিন। মানে ই ফর ইথিলিন।

দাঁতকে ঝকঝকে উজ্জ্বল করতে ফ্লোরাইড টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন আমাদের মোহিত করে। এটার দীর্ঘ ব্যবহার ভালো নয়। তাহলে বলতেই পারি এফ ফর ফ্লুরিন।

রান্না করতে তাপ লাগে আর তাপ আসে আগুন থেকে। কয়লা, ঘুঁটে, কাঠ, কেরোসিন, গ্যাস জ্বালানী বা ফুয়েল লাগে। এগুলো হাইড্রোকার্বন। মানে এফ ফর ফুয়েল। উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটি কার না হয় ! টক দই, অঙ্কুরিত ছোলা, সেদ্ধ ডিম, গম, বাদামে গ্লুটামিন থাকে। গ্লুটামিন উদ্বেগ কমায়। তাই অ্যাংজাইটি দূর করতে ওষুধ নয়, চাই গ্লুটামিন-খাবার। ঘরে ঘরে আছে গ্লুটামিন-খাবার। তাই জি ফর গ্লুটামিন।

লোকটা বলছেন, আগে আগাছা তুলতে জন খাটতো। এখন জমিতে আগাছানাশক বা হার্বিসাইড ছেটানো হয়, আগাছা ঝলসে যায় আর সহজে জমি পাওয়া যায়। তবে জমির মাটি বিষাক্ত হয়ে যায়। আগাছানাশক জলে ধুয়ে জলাশয়ে মেশে, জল জীবরা যেমন, মাছ, ব্যাঙ, পোকা মাকড়, সাপ মারা পড়ে। ওগুলো খেয়ে পাখি, পশু মারা যায়। ফসলে বিষাক্ত আগাছানাশক থাকে। ঐ বিষ খাবারের সাথে খাচ্ছি রোজ। ঘরে ঘরে বিষ আগাছানাশক বা হার্বিসাইড। এইচ ফর হার্বিসাইড।

লোকটা বলছেন, পোকা বা কীটও পরিবেশের বন্ধু হয়, যেমন মাকড়সা, লেডী বার্ড বিটল, ড্রাগন মাছি, বোলতা, ঘাস ফড়িং, উরচুঙ্গা ... এরা ফুলে ফুলে পরাগ মেলায়। শত্রু বা ফসলের অপকারী পোকা যেমন লেদা পোকা, শিষ কাটা পোকা, ছাতরা পোকা, সবুজ পাতা ফড়িংদের মেরে ফেলে। মানে বন্ধু কীটেরা শত্রু পোকাদের মারে আর ফসল রক্ষা করে। আমরা ক্ষতিকারক পোকা মারতে কীটনাশক বা ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করি। ফলে উপকারী পোকাও মারা যায়। জল, মাটি, বাতাস আর আমাদের খাবার বিষাক্ত হয়। কিছু কীটনাশক

বহুদিন ধরে শরীরে জমে থাকে আর ক্যান্সার করে। এরা POPs বা পারসিসটেন্ট অর্গানিক পলুউট্যান্টস। তাহলে আই ফর ইনসেকটিসাইড।

গুড় আসলে সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজের মিশ্রণ। এতে জিঙ্ক, আয়রন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, 0.1% চর্বি আর 0.4% প্রোটিন থাকে। গুড় উপকারী ও উপাদেয়। সাবধান! নকল গুড় সুদৃশ্য ও ঝকঝকে। মিষ্টির দোকানের গাদে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট, সোডিয়াম ফরমালডিহাইড সালফোক্সিলেট, ফসফরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট আর লাল রং মিশিয়ে তৈরি করা হয় ভেজাল গুড়। পাটালির নামে সারাবছর খাচ্ছেন বিষাক্ত কেমিক্যালস। তাহলে জে ফর গুড় বা জ্যাগারি। ঘরে ঘরে রসায়ন।

দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস, কম স্ট্যামিনা, উচ্চ রক্তচাপ,ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি, অহেতুক জ্বর জ্বর ভাব এসবেরই কারন হতে পারে নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের ঘাটতি। কোথায় পাবো নাইট্রোজেন মনোক্সাইড? হাঁটলে,ব্যায়াম করলে শরীরে নাইট্রোজেন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এটি vasodilator মানে রক্তনালিতে রক্তপ্রবাহ বাড়ায় এবং রক্তচাপ কমায়। পালং, লাল বিট, আদা, রসুন, হলুদ, লেবু শরীরে নাইট্রোজেন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে। মুখের ভিতরে কিছু ব্যাকটেরিয়া (যেমন, Nitrobacter) নাইট্রেটকে নাইট্রোজেন মনোক্সাইড করে। সাবধান! বেশ কিছু টুথপেস্ট ও মাউথওয়াশ ঐ উপকারি ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। মদ ও ধূমপান নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের উৎপাদন ব্যাহত করে। এন ফর নাইট্রোজেন মনোক্সাইড।

লোকটা বলছেন, পি ফর প্যাকেটস অ্যান্ড পলিউশন। বিভিন্ন প্যাকেটের বিভিন্ন আয়ু—মাটিতে মিশতে কাগজের 2 থেকে 5 মাস, কাঠ ও টিনের 50 থেকে 100 বছর, অ্যালুমিনিয়ামের 80 থেকে 100 বছর, প্লাস্টিক ও স্টাইরোফোমের 500 বছর বা অনন্তকাল, কাঁচ, টেরাকোটা বা পোড়া মাটির 1 মিলিয়ন বছর লাগে। প্যাকেট মানেই জঞ্জাল। এত জঞ্জাল যাবে কোথায়?

স্বাদের জন্য খাবারে লবণ যোগ করি। লবনের প্যাকেটের পিছনে কি লেখা আছে জানেন? লেখা আছে: IODISED SALT CONTAINS PERMITTED ANTICAKING AGENT INS 551। INS 551 হচ্ছে মিহি সাদা বালি বা কোয়ার্জ পাউডার বা সিলিকন ডাইঅক্সাইড। লবণ, খুব মিহি চিনি, গুড়ো মশলা, কফি আরও অনেক গুড়ো জিনিসকে ডেলাহীন ঝর ঝরে রাখতে কোয়ার্জ পাউডার বা বালি মেশানো হয়। নিজের অজান্তে রোজ খাচ্ছেন বালি। কি মারাত্মক! ঘরে ঘরে রসায়ন। কিউ ফর কোয়ার্জ।

ভাজা ভুজি সুস্বাদু কিন্তু হার্টের জন্য ভালো নয় কারন একই তেল বারবার গরম করা ও রান্নায় ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত উত্তপ্ত বা বারবার গরম করা তেল ধীরে ধীরে ভেঙে যায়, জারিত ও পলিমারাইজড হয়, free radicals এবং ট্রান্স ফ্যাট উৎপন্ন হয়। ঐ তেলের গন্ধ ও স্বাদ খারাপ হয়ে যায়। এককথায় তেল বিষাক্ত বা Rancid হয়ে যায়। এটা carcinogenic। বারবার গরম করা তেল বিষাক্ত বা Rancid এই ঘটনাকে Rancidity of oil and fats বলা হয় অতএব R for Rancidity।

ধোয়া, ধূলি আর দূষণ। প্রতিঘরে অদৃশ্য ধোয়া বা স্মোক, তাই ঘরে ঘরে নিশ্চিত দূষণ। দহন মানেই কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড,সালফার ডাই অক্সাইড। উৎস—ধুপকাঠি, মশার কয়েল, তেল, সিগারেট, বিড়ি, মোমবাতি, প্রদীপ, বাজি, গ্যাস, কয়লা, কাঠ, আবর্জনা দহন ... এস ফর স্মোক। টি ফর টারমেরিক। হলুদের কার্কিউমিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, তঞ্চন প্রতিরোধী, রক্ত পাতলা করে, খারাপ কোলেস্টেরল LDL কমায়, রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, দাঁতের ক্ষয় ও ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রোধ করে,সর্দি এবং কাশির সাথে লড়াই করে, ক্ষত সারায় ও প্রদাহ কমায়। হলুদের হরেক গুণ।

লোকটা বললেন, কে, এল, ইউ, ভি, এক্স, ওয়াই আর জেড পরে বলবো, শেষে বলি W for water and water bottles। পৃথিবী পৃষ্ঠের তিন চতুর্থাংশ জল, তবুও পানীয় জলের জন্য হাহাকার। প্যাকেট জল আর RO বা reverse osmosis জল ব্যবসা জমজমাট। RO সিস্টেম জল থেকে বেশিরভাগ খনিজ অপসারণ করে, জল আম্লিক হয়ে যায় যা পানের অযোগ্য। RO জল স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এর উপরে জল অপচয়—এক লিটার RO জল উৎপাদন করতে চল্লিশ লিটার জল অপচয় হয়। বোতলের জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক, থ্যালেটস, বিসফেনল-A থাকে যা থেকে ক্যান্সার হতে পারে। জলকে বোতলবন্দী করতে প্লাস্টিক লাগে, এটা পেট্রোলিয়ম মানে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পাওয়া যায়। ঐ দহন জনিত কারনে প্রতি বছর 2.5 মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। অতএব জল ব্যবসার অর্থ গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

এর পাশাপাশি ব্যবহৃত ফাঁকা বোতলগুলো যাবে কোথায়? এতো জঞ্জাল যাবে কোথায়?

একটা বই দেখিয়ে তিনি বললেন, আমার এই বইয়ে ঘরে ঘরে রসায়ন। ট্রেন গন্তব্যে এলো। লোকটার হাতে ঘরে ঘরে রসায়ন। কেউ হাতে নিয়ে দেখল না তার একটাও বই।

*লেখক **শ্রী অসীম বসাক** রসায়নের শিক্ষক এবং একজন জনবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: asimkrbasak@gmail.com.*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের জানুয়ারি মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

আবিষ্কার হল ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহ

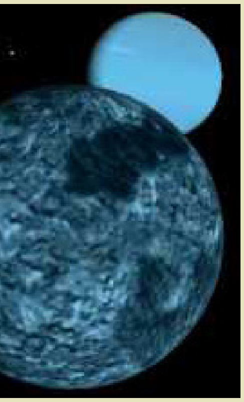

1787 সালের জানুয়ারি মাসের 11 তারিখে আবিষ্কৃত হয়েছিল সৌরজগতের সেই সময়কার শেষ ও সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহ, টাইটানিয়া ও ওবেরন। এই আবিষ্কারকের নাম উইলিয়াম হার্শেল, যিনি 1781 সালে আবিষ্কার করেছিলেন ইউরেনাস গ্রহটিকে। আর এই দুটি ছিল ইউরেনাসের প্রথম আবিষ্কৃত দুটি গ্রহ। টাইটানিয়া প্রকৃতপক্ষে ইউরেনাসের সর্ববৃহৎ উপগ্রহ। এর ব্যাস প্রায় 1577 কিমি, আর ওবেরন তার থেকে সামান্য ছোট, তার ব্যাস 1523 কিমি। তবে টাইটানিয়ার ভর আমদের উপগ্রহ চাঁদের ভরের তুলনায় কুড়ি ভাগের একভাগ। কিন্তু তাও এটি সৌরজগতের উপগ্রহদের মধ্যে অষ্টম স্থান দখল করে আছে। ছোট-বড় মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ইউরেনাসের আবিষ্কৃত উপগ্রহের সংখ্যা 27, যাদের কিছু রয়েছে ইউরেনাসের বলয়ের আর গ্রহের মধ্যে, যেগুলিকে বলা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ উপগ্রহ। আর যেগুলি রয়েছে বলয়ের বাইরে তাদের বলা হচ্ছে বর্হি-উপগ্রহ। তবে 1727 সালে চিহ্নিত এই দুই উপগ্রহ আর একটি কারণে সৌরজগতে বিশেষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। এই দুটির নামকরণ প্রথামত কোন পৌরাণিক চরিত্রের নামে হয় নি, এই নামদুটি এসেছে বিখ্যাত সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রদের নাম থেকে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মিডসামার নাইট ড্রিমের চরিত্র হিসেবে আমরা পেয়েছি টাইটানিয়া আর ওবেরনকে। এবং এই দুই গ্রহের নামকরণে সর্বপ্রথম উঠে এসেছে সাহিত্যের চরিত্রের নাম।

ডেভির নিরাপত্তা বাতির কয়লাখনিতে প্রথম পরীক্ষা

ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার হামফ্রে ডেভি আমাদের কাছে মাইকেল ফ্যারাডের গুরু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্ভবত বেশি পরিচিত। কিন্তু একাধিক মৌল আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার নাম। আর তার যে অবদানটির জন্য একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তার নাম সেটি হল খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্য উদ্ভাবিত একটি বিশেষ ধরণের বাতি। কয়লা খনির অভ্যন্তরে নানা ধরণের বিপজ্জনক ও বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে ইংল্যান্ডে উনবিংশ শতকে বহু শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সময়কার বিজ্ঞানী মহলে এই সমস্যার একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাওয়াটা ছিল এক ধরণের চ্যালেঞ্জ। ডেভির তৈরি বাতিতে জ্বালানি হিসেবে ভোজ্য তেল ব্যবহৃত হয়েছিল এবং একটি পলতে সেই তেলের সাহায্যে জ্বালান হয়েছিল। তবে আলোর শিখা চারদিক থেকে ঢাকা ছিল এক অত্যন্ত সরু ছিদ্র বিশিষ্ট তারের এক জাল দিয়ে। তার ফলে শিখাটি বাইরের বাতাসের যোগান পেত, কিন্তু ওই আগুন বাইরে আসতে পারত না। বাতাসের সঙ্গে অবাঞ্ছিত গ্যাস শিখার সংস্পর্শে এলে তার রঙের পরিবর্তন হত ও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হত। ডেভি এই কাজের জন্য রয়েল সোসাইটির থেকে পুরস্কার ও অন্য স্বীকৃতি পেলেও তা সম্পূর্ণ বিতর্কমুক্ত ছিল না। এই কৃতিত্বের অন্য দাবীদারও ছিলেন। যাই হোক, ডেভির নিরাপত্তা বাতি সারা পৃথিবীতে বহু কয়লা খনির শ্রমিকের জীবন রক্ষা করছে।

রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হল

2024 এ তিনশ’ বছরে পা রাখছে সারা বিশ্বের এক অত্যন্ত নামী ও উজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী একটি সারস্বত প্রতিষ্ঠান। 1724 সালের 28 জানুয়ারি রাশিয়ার তৎকালীন সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে পরামর্শদাতা ছিলেন জার্মান গণিতজ্ঞ গটফ্রিড লেবিনিৎস। এই অ্যাকাডেমি গড়ে ওঠে কিছুটা 1660 সালে প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের রয়েল সোসাইটির অনুকরণে। গোড়া থেকেই রাশিয়ার শাসকেরা এই অ্যাকাডেমিকে সমৃদ্ধ করার কাজে সাহায্য নিয়েছেন বিদেশি পন্ডিতদের যাদের অধিকাংশই এসেছেন ইওরোপ থেকে। গোড়াতে এই সংস্থাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা থাকলেও ধীরে ধীরে সংস্থার গতিপথ পালটে তা হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের গবেষণা কাজের পৃষ্ঠপোষক ও দিক নির্দেশক। প্রতিষ্ঠনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে নানা গবেষণা পত্রিকা, রিপোর্ট, সংগঠিত হয়েছে অজস্র বিজ্ঞান সম্মেলন। এখন এই অ্যাকাডেমির সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় আর দেশের বহু গবেষণাগার এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প এই সংস্থার থেকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য পাচ্ছে। সোভিয়েত আমলে এই অ্যাকাডেমির ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেলেও অ্যাকাডেমি তার উচ্চ মান ধরে রেখেছে। এখন এই অ্যাকাডেমির সদস্যদের মধ্যে কেবল রাশিয়ার নয়, রয়েছেন বিদেশেরও বেশ কিছু নামী বিজ্ঞানী।

জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

আন্দ্রেঁ মারি অ্যাম্পিয়ার

ইলেকট্রিকের জিনিসপত্র কিনতে গেলে প্রায়ই আমাদের উচ্চারণ করতে হয় তার নাম। প্লাগ পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের নেবো নাকি পনেরো অ্যাম্পিয়ারের যখনই খোঁজ করি তখনই উঠে আসে ফরাসি পদার্থবিদ আন্দ্রেঁ মারি অ্যাম্পিয়ারের নাম। চল-তড়িতের ক্ষেত্রে তার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের এস আই এককের নাম হয়েছে তারই নামের অনুসারে। আজ থেকে প্রায় আড়াই'শ বছর আগে 1775 সালে 20শে জানুয়ারি তিনি প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। 1800 খৃষ্টাব্দে চল-তড়িতের আবিষ্কারের পরে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে তার প্রয়োগের বিষয়টি অনেক বিজ্ঞানীকে উৎসাহিত করে তোলে। কোন ধাতব তারের মধ্যে দিয়ে চল-তড়িতের প্রবাহ হলে যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তা দেখান ড্যানিশ বিজ্ঞানী ওরস্টেড 1820 সালে। তার অল্প পরে অ্যাম্পিয়ার দেখান যে দুটি সুপরিবাহী উপাদানের তৈরি তার পাশাপাশি রেখে দুটিতে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে তারা পরস্পরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি পরিবাহী তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যে চুম্বক ক্ষত্র তৈরি হবে তার পরিমাণগত গণনা করেন। তাছাড়া তিনি তড়িৎ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্ণয়ের জন্য সূত্র উপস্থাপিত করেন।

আবদুস সালাম

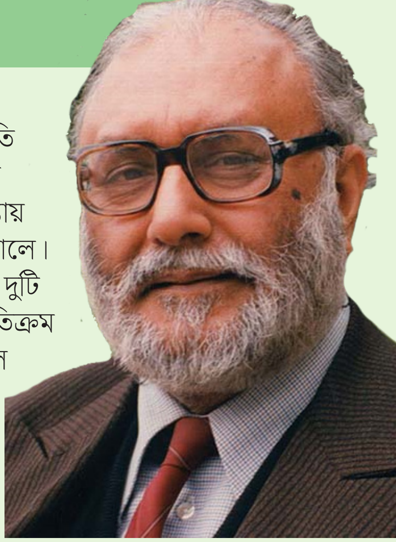

আব্দুস সালামের জন্ম 1926 সালের 29শে জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন পাঞ্জাব প্রদেশের পশ্চিমাংশের এক গ্রাম ঝাং এ। চল্লিশের দশকে লাহোরে কলেজে পড়ার সময় তিনি পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন, বিশেষ করে তার এক বাঙালি অধ্যাপকের পড়ানোর ফলে। তারপর থেকে তিনি দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে তার গবেষণাকাজ করে গেছেন। দেশ বিভাগের পরে তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হন। তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং পাকিস্তানের বিজ্ঞানী হিসেবে প্রথম নোবেল পুরস্কারের অংশীদার হন 1979 সালে। তিনি ও তার সহকর্মীরা তাত্ত্বিকভাবে দেখান যে তড়িৎ-চুম্বকীয় বল এবং তড়িৎ-দুর্বল বল আদতে একই বলের দুটি ভিন্ন রূপ। এই কাজের মধ্যে দিয়ে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বলগুলির একত্রীকরণের কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। ইতালির ত্রিয়েস্ত শহরে তিনি একটি বিশেষ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স) গড়ে তোলেন মূলত উন্নয়শীল দেশের পদার্থবিজ্ঞানী ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকদের আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। 1996 সালে তার মৃত্যুর পরে এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয়েছ তার নামানুসারে। একেবারে ভারতভাগের সময়ে সালাম কিছুটা বাধ্য হয়েই তার আই সি এস হওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে পদার্থবিদ্যার পড়াশুনা বেছে নেন। আধুনিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় তার অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত।

স্টিফেন হকিং

স্টিফেন হকিং-কে কেবল আধুনিক কালের একজন প্রথম সারির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 1942 সালের 8ই জানুয়ারি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল ব্রহ্মান্ডবিদ্যা (cosmology), তবে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তবে পদার্থবিদ্যায় তার বিরাট অবদানের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে তিনি শারীরিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের কাজ করার ক্ষমতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। পঁচিশ বছরে পৌঁছনোর আগেই তিনি মোটরনিউরন রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগের প্রকোপে তিনি তার শারীরিক বহু ক্ষমতা হারাতে শুরু করেন, বন্ধ হয়ে যায় তার কন্ঠও। কিছু বিশেষ প্রযুক্তির উদ্ভাবনা তাকে কমপিউটারের সাহায্যে কথাবার্তা আদান প্রদানের, গবেষণাকাজ আলোচনা করার এবং বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তিনি সেগুলির সাহায্য নিয়ে একদিকে পদার্থবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, অন্যদিকে তার সার্বিক জীবন যাপন শারীরিক সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন মানুষদের কাছে বহন করে এনেছে এক অত্যন্ত উৎসাহজনক বার্তা। তিনি কুড়ি বছর ধরে ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের লুকাসিয়ান প্রফেসার। একসময় অত্যন্ত সন্মাঞ্জনক এই পদ অতীতে অলঙ্কৃত করেছেন স্যার আইজাক নিউটন।

গ্রন্থ সমালোচনা

পৃথিবী প্রাণ ও মহাকাশ

পৃথিবী প্রাণ ও মহাকাশ
ড. সিদ্ধার্থ রায়
মূল্য: 500.00

‘একুশ শতক’ প্রকাশিত ‘পৃথিবী প্রাণ ও মহাকাশ’ সংকলনে বিজ্ঞান বিষয়ক মোট আটতিরিশটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভূমিকাতে লেখক সিদ্ধার্থ রায় লিখেছেন যে লেখাগুলি চার বছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; তাদের চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে—ভৌত বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, এবং জীবন বিজ্ঞান। লেখক নিঃসন্দেহে কাজ চালানোর সুবিধার জন্যই এই ভাগ করেছেন। তার থেকেও বড় কথা হল যে আধুনিক বিজ্ঞানে নানা শাখার মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক বিশেষ জরুরি; এই সংকলনের অনেকগুলি প্রবন্ধ থেকে তার পরিচয় মেলে।

প্রথম প্রবন্ধ থেকে আমরা দেখি যে আধুনিক বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা ও আরোহী যুক্তিজালের উপর। অন্য এক প্রবন্ধে প্রাচীন গ্রিক জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা কিভাবে পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাপ করেছিলেন তার সুন্দর বর্ণনা আছে। গ্রিক সভ্যতার পতনের পরে মধ্যযুগে ইউরোপের অন্ধকার সময়ে আরবরা বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে থেকে আবার ইউরোপেই ফিরে গিয়েই সে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। প্রবন্ধগুলিতে সেই কথা চমৎকার ভাবে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম বিজ্ঞানচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলেও সেখানে মূলত ভৌত বিজ্ঞানের কথাই এসেছে।

ভৌত বিজ্ঞান বিভাগের বাকি প্রবন্ধগুলিতে এসেছে বিশ্বে মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি, তাদের আবিষ্কার, পরমাণু ও তার ভিতরের জগৎ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ, এবং সবশেষে রহস্যময় অদৃশ্য বস্তু ও শক্তির কথা। ‘পদার্থের জন্মরহস্য’ প্রবন্ধে লেখক সুন্দরভাবে মৌলিক পদার্থের সৃষ্টির কথা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। ‘মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারর কাহিনি’ প্রবন্ধে মৌলিক পদার্থ বিষয়ে আমাদের ধারণার পরিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে মূলত তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কারের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধটিতে বিশেষ ও সাধারণ দুই আপেক্ষিকতার কথাই এসেছে। বিশেষ আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে আলোচনাটা ভারি চমৎকার, তবে কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গেল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগে মহাবিশ্বের আয়তন ও গঠন বিষয়ে বিতর্ক এবং বিগ ব্যাং ও স্থিতাবস্থার তত্ত্বের বিরোধের কথা এসেছে। ঠিক তেমনি ভূবিজ্ঞান বিভাগটি শুরু হয়েছে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কিত বিতর্ক দিয়ে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে শেষেরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেলভিন কোথায় ভুল করেছিলেন এবং কেমনভাবে আমরা পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে আধুনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম তা নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা করেছেন লেখক। তারাদের বিবর্তন, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়কর বস্তু, সৌরজগৎ, গ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদির কথা এসেছ কয়েকটি প্রবন্ধে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধগুলি থেকে। একই কথা বলা যায় পরে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন সংক্রান্ত লেখাতে।

ভূবিজ্ঞান বিভাগে মহাদেশীয় মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব, আবহমণ্ডল, সমুদ্রমণ্ডল বা হিমযুগ নিয়ে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

জীবন বিজ্ঞান বিভাগে আছে প্রাণের উদ্ভব, বিবর্তন, বংশগতি, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ। পৃথিবীতে প্রাণ এমনভাবে এলো, ডিএনএর গঠন আবিষ্কার, প্রোটিন সংশ্লেষে জিনের ভূমিকা, বার্ধক্য ও মৃত্যু, ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণা গত একশো বছরে জীবন বিজ্ঞানকে কীভাবে আমূল পরিবর্তিত করেছে, সেই ইতিহাস এসেছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। টিকা কেমনভাবে কাজ করে সেই বিষয়ে আলোচনা আছে ‘জীবাণু, প্রতিষেধক ও অনাক্রম্যতা’ প্রবন্ধে। অন্য প্রবন্ধগুলির মতোই সহজ ভাষাতে লেখক জীবন বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কেও সহজবোধ্য করে তুলেছেন।

একই মলাটে নানা বিষয়গুলি ধরা পড়ার ফলে পৃথিবীর বয়স, মহীসঞ্চরণ, বিবর্তন বা নক্ষত্রের ভিতরে শক্তির সৃষ্টির মতো বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কও মনোযোগী পাঠকের নজর এড়াবে না। সমস্ত প্রবন্ধই তথ্যপূর্ণ ও সহজসরল ভাষাতে লেখা। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত, সেগুলিকে একই জায়গাতে আনার ফলে কিছু কথার পুনরুক্তি হয়ে গেছে; সংকলনের সময় কিছুটা সম্পাদনা করলে ভালো হত। দু-একটি প্রবন্ধ যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে; লেখাগুলি ভারি সুন্দর, তাই আরো কিছু পাওয়ার আশা ছিল। বইয়ের ছাপা সুন্দর, পাতা ও বাঁধাই চমৎকার। বেশ কয়েকটি বানান ভুল ও কিছু তথ্যগত প্রমাদ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা জরুরি। তবে এ সবই সামান্য ত্রুটি। বিষয়বৈচিত্রে ও লিখনশৈলীতে এই সংকলনটি বাংলা ভাষাতে সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বইদের মধ্যে প্রথম সারিতে জায়গা করে নেওয়ার যোগ্য।

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়
(ggphy@caluniv.ac.in)

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।